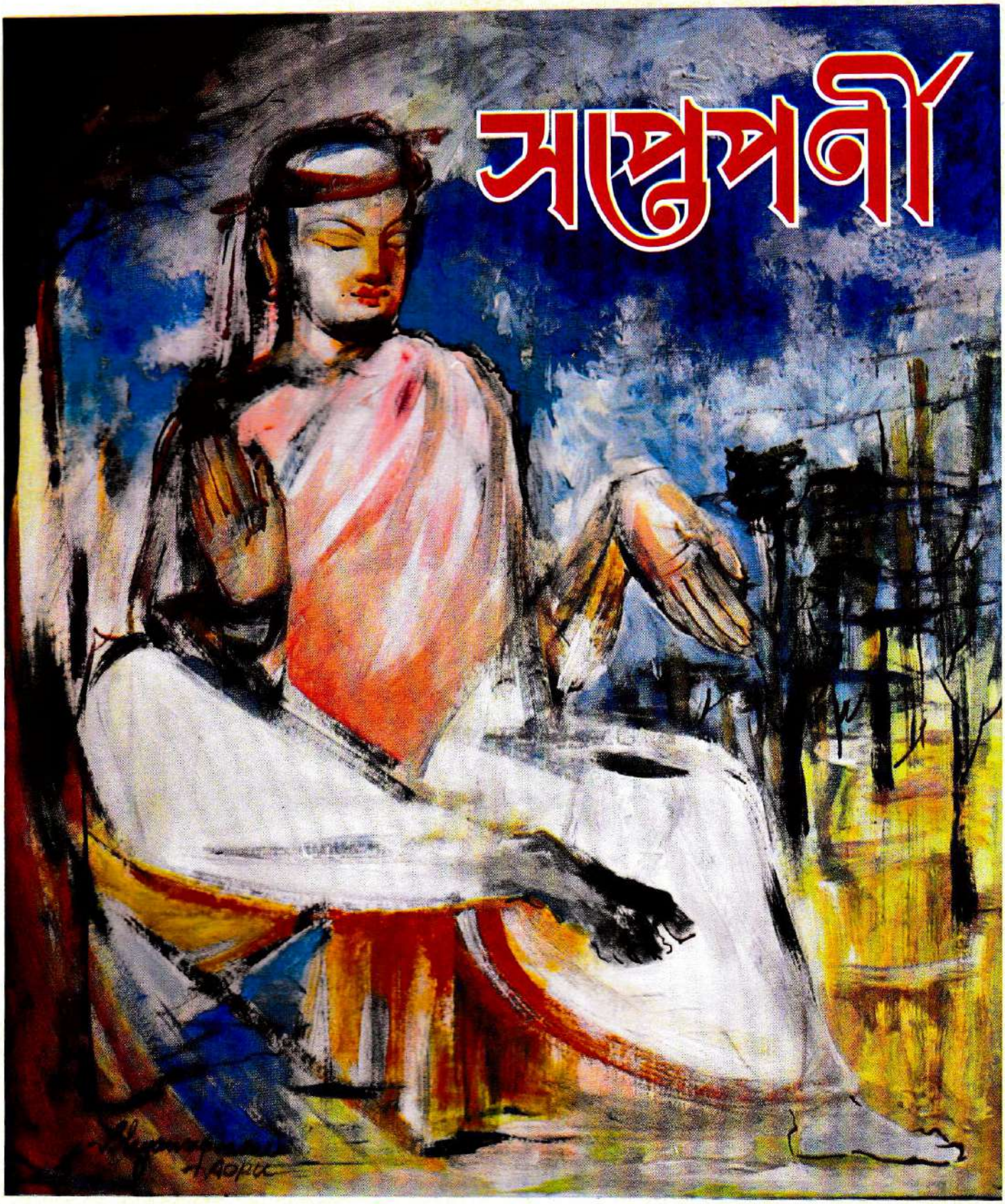

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

২০২৩-২০২৪

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

সাবড়াকোন :: বাঁকুড়া

২০২৩–২০২৪

"পদ্মের মত শিশুদের মন, সূর্যের আলোয় তা অল্প অল্প পাপড়ি মেলে সৌরভ ছড়ায়। যদি আলো বাতাস না থাকে তাহলে শিশুমন ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায়। শিশুমনে আলো বাতাস বইয়ে দেওয়াই শিক্ষকের কাজ।"

— রবীন্দ্রনাথ

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি

পত্রিকা বিভাগ	ঃ	সভাপতি - শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা সহ-সভাপতি - সৌভিক মিদ্যা সম্পাদক - রাহুল সরকার সহ-সম্পাদক - অর্ণব রজক
পত্রিকা সদস্য	ঃ	সাহেব মল্ল, প্রত্যুষ গুইন, রাখ কুম্ভকার, অনল কুমার সরেন, বিকাশ মাহাত, রাজীব বাঙ্গাল, পীযূষ নন্দী, কৌশিক সৎপতি, সায়ক নন্দী, শত্রুঘ্ন প্রামাণিক, দেবাঙ্গন পাঙ্গাস।
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	শ্রীযুক্ত সুভাশিস দাস
সাংস্কৃতিক বিভাগ	ঃ	জয় চৌধুরী, মুকুল ঘোষ, শুভজিৎ মহাপাত্র, সুদীপ মাহাত, মনোজিত ঘোষ, মিলন হেমব্রম, সুজয় সরেন, সুমন্ত রায়, শান্তনু বাউরী, উজ্জ্বল শ, সুরজিত দুবে।
ক্রীড়া বিভাগ	ঃ	সৌকত গিরি, অরূপ মণ্ডল, মিলন হেমব্রম, অমিয় দুলে, অমিত কুণ্ডু, মুকুল ঘোষ, সোমনাথ দুলে, সুমন লোহার।
প্রচ্ছদ	ঃ	শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা।

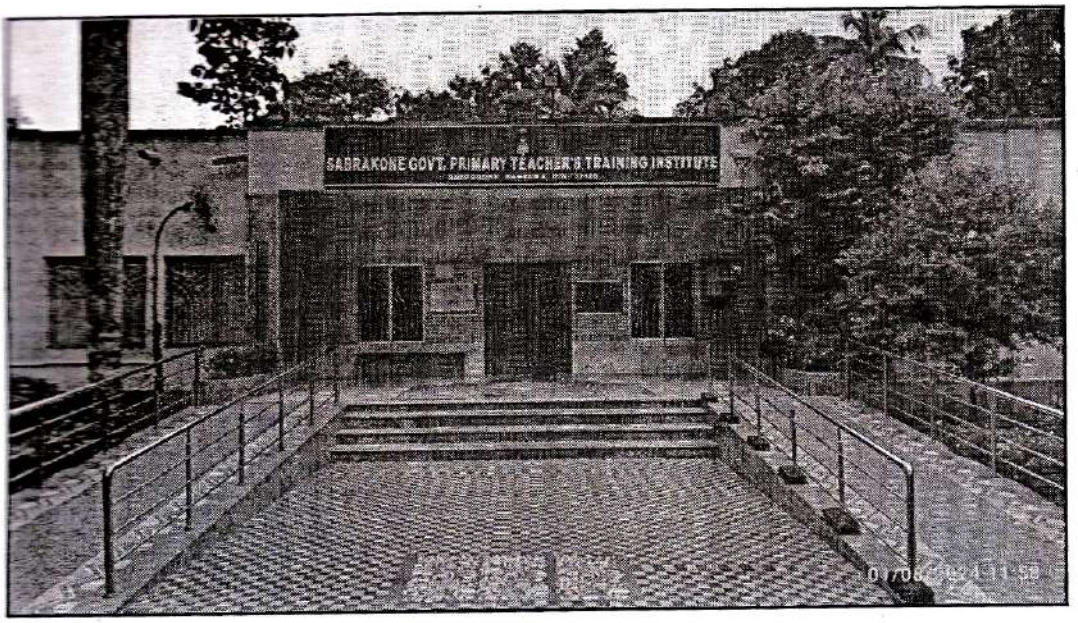

প্রতিষ্ঠানে যারা আছেন

শ্রী মনোজ কুমার পাণ্ডে	(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা	(শিল্প শিক্ষক)
শ্রী সুমন্ত দে	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ কর	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী সুমন অট্ট	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী চন্দন পাল	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী বলরাম পাল	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী শুভাশিস দাস	(অতিথি সঙ্গীত শিক্ষক)
শ্রী গৌরাঙ্গ মাহাত	(কম্পিউটার ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট)
শ্রী ধনা টুডু	(অতিথি শরীরশিক্ষা শিক্ষক)

অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ

অরিন্দম ঘোষ	(Hostel Super)
শ্রী দিলীপ বাউরী	(Group D)
শ্রী দীপঙ্কর মাহাত	(DEO)
শেখ সামিম	(MTS)
শ্রী প্রশান্ত দুলে	(Night Guard)

রান্নাঘরের কর্মীবৃন্দ

শ্রী স্বপন কর, শ্রী রঘুনাথ দুলে, শ্রীমতী রমলা দুলে, শ্রীমতী সুমিত্রা দুলে

২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত বিশেষ কার্যাবলী

- স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
- শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন।
- আগমনী উৎসব।
- নবীন বরণ অনুষ্ঠান।

২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত বিশেষ কার্যাবলী

- স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদ্‌যাপন।
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উদ্‌যাপন।
- প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন।
- রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন।
- প্রাক্তনীদের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।
- স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
- শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন।
- মাননীয় Director SCERT Madam এর সম্মানার্থে অনুষ্ঠান।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

আপনসত্ত্বার বহিঃ প্রকাশই হলো জীবন, সমাজের ধর্ম। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ নিজের চিন্তনকে প্রকাশ করেছিল গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রে বা দুর্বোধ্য স্বরের ভঙ্গিমায়। সভ্যতার অগ্রগতির রথচক্র আজ ও ক্রমে এগিয়ে চলেছে উন্নতির শিখরে। সেই পথচলা আমাদের ও জীবনের অঙ্গ।

সুস্থ জীবনের লক্ষন প্রকাশ পায় সাংস্কৃতিক মনন ও চিন্তনের মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতির প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল সৃষ্টিশীল মনের বৈশিষ্টগুলির লিপিরূপ, আর এই প্রকাশেরই "সপ্তপর্ণী" কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে পরিচর্যার প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ তা দৃঢ়ভাবে পালন করতে বদ্ধপরিকর। প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দের প্রেরণা ও আন্তরিক উৎসাহে এই আস্থা ও কামনা রইল।

ধন্যবাদান্তে —

মনোজকুমার পাণ্ডে

(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক

শিক্ষণ সংস্থা

সম্পাদকীয়

আমাদের পত্রিকা 'সপ্তপর্ণী'-র পক্ষ থেকে সকল পাঠকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালাবাসাকে পাথেয় করে বেশ কিছুটা পথ আমরা একসাথে পেরিয়ে এলাম। এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। 'সপ্তপর্ণী'র পুনর্জন্ম হতে চলেছে, তাই আমাদের লেখক শিল্পী এবং সহযোগী বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এই যন্ত্র সভ্যতার মানুষ ভাবতে ভুলে যাচ্ছে। আজ সবার মুখে একই কথা ''হাতে যে একদম সময় নেই'। সাহিত্যচর্চা প্রায় অবহেলিত, বাংলা ভাষার পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে। তবুও কেউ কেউ তারই মাঝে নামের ভাব কলমের আঁচড়ে কখনো গল্প বা আত্মজীবনী, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গিকের জন্ম, শিল্পীর এই সৃজনশীল সৃষ্টিকে 'সপ্তপর্ণী'র মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের প্রয়াস। 'সপ্তপর্ণী'র ছায়ায় যেন এই সৃষ্টি অবিরত থাকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত।

ধন্যবাদান্তে —
রাহুল সরকার
পত্রিকা সম্পাদক
সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক
শিক্ষণ সংস্থা

নবীনবরণ (২০২৪)

আগমনী উৎসব (২০২৪)

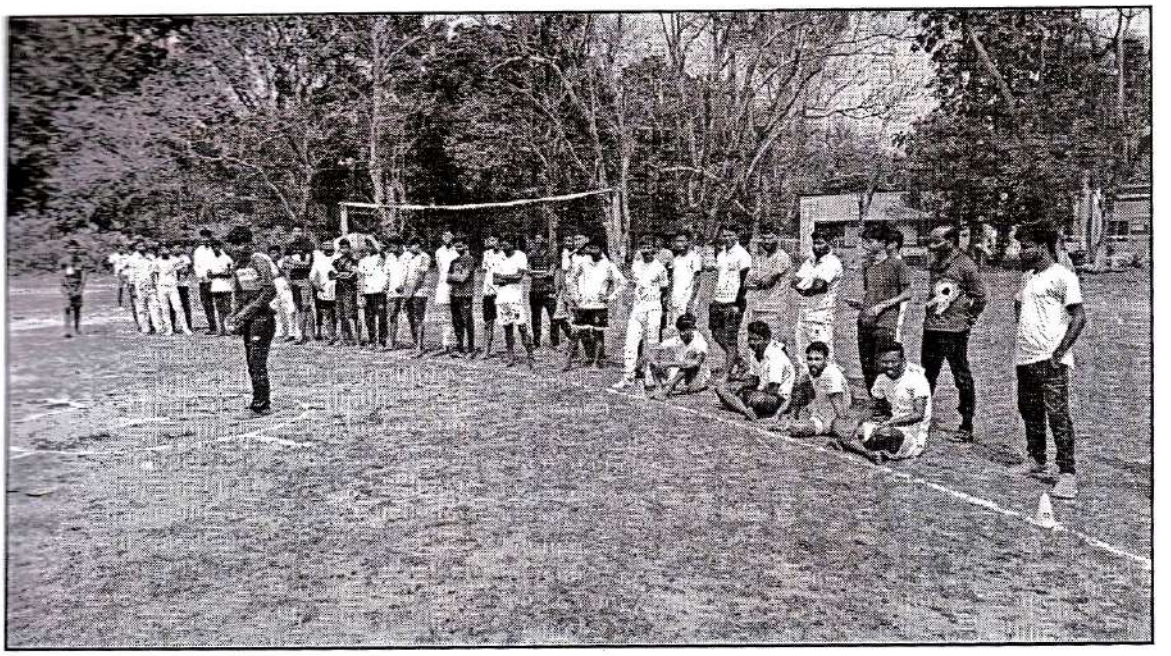

Annual Sports (2024)

Annual Sports (2024)

বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

নেশামুক্তি অভিযান

শিক্ষক দিবস (২০২৩)

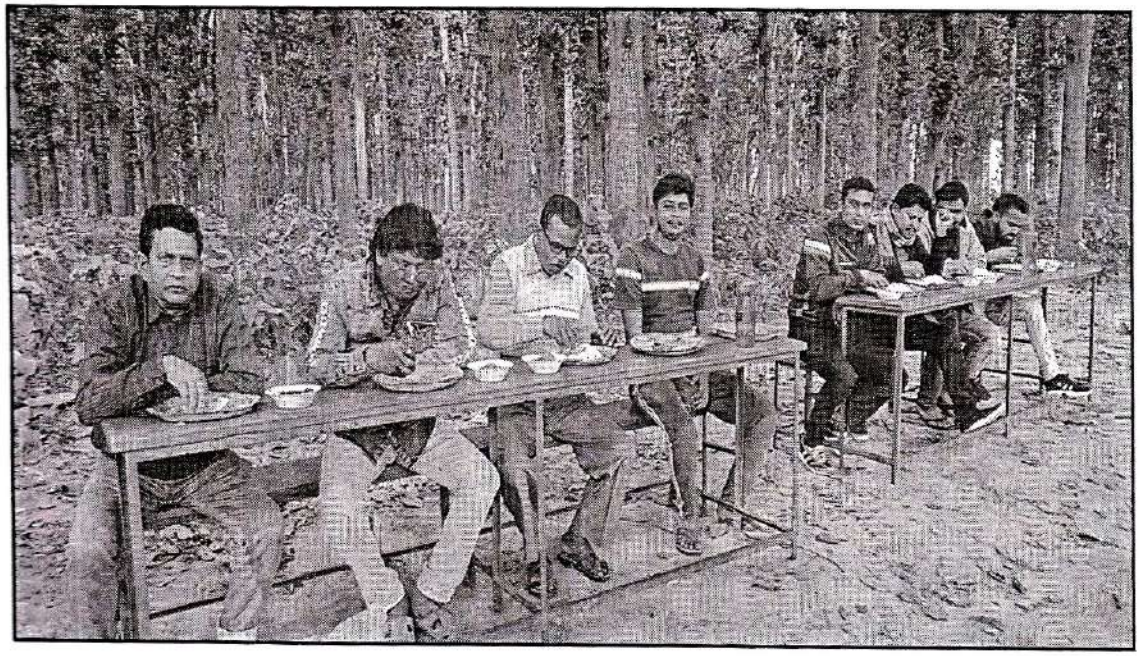

পিকনিক

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন উপলক্ষে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (SCERT) এর প্রতিনিধি বৃন্দ এবং অধ্যাপক এবং অন্যান্যরা নীচের সারির বামদিক থেকে ডানদিক - সুমন্ত দে (অতিথি অধ্যাপক) , রাজেন্দ্র প্রসাদ কর (অতিথি অধ্যাপক), শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা (শিল্প শিক্ষক), সুনীল দাস (R.F. SCERT), ডঃ ছন্দা রায় (অধিকর্তা SCERT), উমাবতি হেমব্রম (R.F. SCERT) , মনোজ কুমার পাণ্ডে (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ), মদন ঘোষাল (অধ্যক্ষ Sanka Govt P.T.T.I), উপরের সারির বামদিক থেকে ডানদিক প্রশান্ত দুলে (Night Guard), দীপঙ্কর মাহাতো (D.E.O), শেখ সামিম (M.T.S), রাহুল সরকার (শিক্ষার্থী শিক্ষক), সুমন্ত বাউরী (শিক্ষার্থী শিক্ষক), সুদীপ মাহাতো (শিক্ষার্থী শিক্ষক), অর্ণব রজ্জক (শিক্ষার্থী শিক্ষক), সৌভিক মিদ্যা (শিক্ষার্থী শিক্ষক), সৌরভ বাউরী (শিক্ষার্থী শিক্ষক), সাহেব মল্ল (শিক্ষার্থী শিক্ষক), শেষের লাইনে আছেন দিলীপ বাউরী (Group -D) , অরূপ মণ্ডল (শিক্ষার্থী শিক্ষক)।

সূচীপত্র

কবিতা

• দোলের দিনে	সুদীপ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)	১
• বিশ্বমাতা	অর্ণব রজক (প্রথম বর্ষ)	১
• আমার স্বদেশ	মিলন হেমব্রম (প্রথম বর্ষ)	২
• এর নাম কী জীবন	সুরজিৎ দুবে (প্রথম বর্ষ)	২
• আমি এক পথিক	সুরজিৎ দুবে (প্রথম বর্ষ)	৩
• কবিতা	সোমনাথ দুলে (প্রথম বর্ষ)	৩
• অতীত স্মৃতি	সোমনাথ দুলে (প্রথম বর্ষ)	৪
• মা	বরকত মোল্লা (দ্বিতীয় বর্ষ)	৪
• খেলাধূলা	সৌরভ বাউরী (প্রথম বর্ষ)	৫
• হাতিয়ার	মুকুল ঘোষ (প্রথম বর্ষ)	৫
• বাবা	শান্তনু বাউরী (প্রথম বর্ষ)	৬
• স্মার্টফোন	রাজীব বাঙ্গাল (প্রথম বর্ষ)	৬
• সবুজ মন	অমিয় দুলে (প্রথম বর্ষ)	৭
• প্রেমের কাহিনী	সৌভিক মিদ্যা (প্রথম বর্ষ)	৭
• বৃষ্টি	অমিত বাউরী (প্রথম বর্ষ)	৭
• অসুখী	রাজীব বাঙ্গাল (প্রথম বর্ষ)	৭
• একাকীত্ব	জয় চৌধুরী (প্রথম বর্ষ)	৮
• সাদা সবার সেরা	উজ্জ্বল সাও (প্রথম বর্ষ)	৯
• অমাবস্যা ও তারাপীঠ	উজ্জ্বল সাও (প্রথম বর্ষ)	১০
• মা	সুমনা মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)	১০
• আমি	চিন্ময় মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)	১১
• ফিরতে চাওয়া	শুভজিৎ মহাপাত্র (প্রথম বর্ষ)	১২
• বৃষ্টি-বাদল	কৌশিক ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)	১২

• ইচ্ছে	কৌশিক শতপথী (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৩
• আমার প্রিয় কবি	কৌশিক শতপথী (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৪
• স্বাধীনতা	সুমন্ত রথ (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৪
• চাওয়া পাওয়া	সাহেব মল্ল (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৫
• হামদের ভাষা-হামদের গরব	তরুণ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৫
• হৃদয় গহীনে তোমার শূন্যতা	বাপন লায়েক (প্রথম বর্ষ)	১৬
• যত মত তত পথ	তন্ময় বাউরী (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৭
• ধ্বংস	অমিত কুণ্ডু (প্রথম বর্ষ)	১৮
• তুমি আসবে বলে	সুমন সরেন (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৮
• এ্যয়েম্বকেশ্বরে কয়েকদিন	মনোজ কুমার পাণ্ডে (Lec-in-Charge)	১৯ - ৩৬
• A Tour To Madhyapradesh	Ranjan Duley	৩৭-৩৮
• অজানা অনুভূতি	অনন্ত মাজি (দ্বিতীয় বর্ষ)	৩৯-৪০
• ভ্রমণ মূলক কাহিনী	শুভজিৎ ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)	৪১
• খাজুরাহো ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ	সুমন সোরেন (দ্বিতীয় বর্ষ)	৪২-৪৪
• শিক্ষামূলক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা	অনুপ কুমার সৎপতি	৪৫-৪৬
• মধ্যপ্রদেশ খাজুরাহো	বরকত মল্ল (দ্বিতীয় বর্ষ)	৪৭-৪৮
• মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	বিকাশ ব্যানার্জী (দ্বিতীয় বর্ষ)	৪৯-৫২
• মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	সুমন বাউরী (দ্বিতীয় বর্ষ)	৫৩-৫৭
• কুয়াশার চাদরে মোড়া নির্জন রাস্তা	প্রত্যুষ গুঁই(দ্বিতীয় বর্ষ)	৫৮-৬০
• শিক্ষিত সমাজের অশিক্ষিত রূপ আচরণ	অনুপ কুমার সৎপতি	৬১-৬২
• শিক্ষণ অভিজ্ঞতা	সৌম্যদীপ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)	৬৩-৬৫
• হোস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা	শোভন ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)	৬৬
• কলেজ ও হোটেল এর প্রথমদিন	সায়ক নন্দী (দ্বিতীয় বর্ষ)	৬৭
• বাহা উৎসব	ইন্দ্রজিৎ হাঁসদা (দ্বিতীয় বর্ষ)	৬৮-৬৯
• শিক্ষার্থীদের প্রতি	সুমন মণ্ডল	৭০

• কলিযুগের স্বর্গপুরী	সুমন বাউরী (দ্বিতীয় বর্ষ)	৭১-৭৪
• নিঝুম রাতে ভূতের সাথে	কৌশিক ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)	৭৫
• এক ভুতুড়ে কাণ্ড	সত্যজিৎ রায়	৭৬
• ছেলেবেলা	পীযূষ নন্দী (প্রথম বর্ষ)	৭৭
• রূপকথার গল্প	শত্রুঘ্ন প্রামাণিক (প্রথম বর্ষ)	৭৮-৮০

প্রথম সারি - বামদিক থেকে (দাঁড়িয়ে) প্রশান্ত দুলে (Night Guard), অরিন্দম ঘোষ (Hostel Supper), গৌরাঙ্গ মাহাত (C.L.A), শেখ সামিম (M.T.S), দীপঙ্কর মাহাতো (D.E.O), মনোজ কুমার পাণ্ডে (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ), শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা (শিল্প শিক্ষক), শুভাশিস দাস (অতিথি অধ্যাপক), মনোজিৎ ঘোষ (শিক্ষার্থী শিক্ষক)

দ্বিতীয় সারি - বামদিক থেকে (বসে শিক্ষার্থী শিক্ষক) রাজীব ঘোষাল, জয় চৌধুরী, সুমন লোহার, অরূপ মণ্ডল, রাখ কুম্ভকার, সুজয় সরেন, শত্রুঘ্ন প্রামানিক, প্রত্যুষ গুইন

তৃতীয় সারি - ডানদিক থেকে (বসে, শিক্ষার্থী শিক্ষক) সৌগত গিরি, সুরজিৎ দুবে, সুদীপ মাহাত, কৌশিক সৎপতি,দেবাঞ্জন পাঙ্গাস, উজ্জ্বল শাও

চতুর্থ সারি - ডানদিক থেকে (বসে শিক্ষার্থী শিক্ষক) সুভজিৎ মহাপাত্র, অর্ণব রজ্জক, সোমনাথ দুলে, পীযুষ নন্দী, অমিত কুণ্ডু

পঞ্চম সারি - ডানদিক থেকে (বসে, শিক্ষার্থী শিক্ষক) মিলন হেম্ব্রম,বাপী লায়েক, অমিয় দুলে, অনল কুমার সরেন, সৌরভ বাউরী, তন্ময় বাউরী

"দোলের দিনে"

সুদীপ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

মিলবো মোরা সবার সাথে
ফাল্গুন মাসের দোলের বেলা।
মাতবো মোরা আবির নিয়ে
চলবে মোদের হোলি খেলা।
বকুল, পারুল, আমের মুকুল
হবে মোদের খেলার সাথী।
পিচকারী রঙ বালতি নিয়ে
করবো মোরা মাতামাতি
কেউ বা হবে নাস্তানাবুদ
কেউ বা করবে গালাগালি,
রঙ মাখিয়ে জব্দ করে
জোরে দেব হাততালি।
রঙ মাখবে ভূত সাজবো
আমায় চেনা কষ্ট হবে।
খেলার শেষে বলবে তুমি
এবার আমি আসি তবে।
আসবো আবার দোলের দিনে
তোমরা সবাই ভালো থেকো।
খেলবো হোলি সবার সাথে
আমার কথা মনে রেখো।

•

বিশ্বমাতা

অর্ণব রজক (প্রথম বর্ষ)

বিশ্ব মাতার বুকে কত সবুজের খেলা,
এই সবুজে মিটেছে কত মানুষের জ্বালা।
তৃষ্ণার জন্য নদী আছে, নদীতে নীল জল,
সেই নদীতে আছে কত মাছের কোলাহল।
খাদ্যের জন্য বন আছে, বনেতে সবুজ ফল,
সেই বনেতে আছে কত পশুদেরই দল।
বিশ্ব মাতার বুকে আছে ঘন নীল আকাশ,
সেই আকাশে আছে কত পাখিদেরই ঝাঁক।
হিন্দু আছে, মুসলিম আছে, আছে কত খেলা,
সেই খেলাতে মেতে ওঠে বাঙালির মেলা।
বিশ্ব মাতার বুকে কত সবুজের খেলা,
এই সবুজে মিটেছে কত পশু-পাখির জ্বালা।
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জশীতলাম,
'বন্দেমাতরম' নিয়ে হয়েছে কত গান।
জাতীয় পাখি ময়ূর আর জাতীয় পশু বাঘ,
বনের রাজার নাম নিলে আসে সিংহরাজ।
বিপ্লবীদের মন্ত্র হল 'বন্দেমাতরম্'
এই মন্ত্র নিয়ে কত বিপ্লবীর মরণ।
বিশ্ব মাতার বুকে কত সবুজের খেলা,
এই সবুজে মিটেছে কত বাঙালির মেলা।

•

'আমার স্বদেশ'

মিলন হেমব্রম (প্রথম বর্ষ)

১৯৪৭ সনে ১৫ই আগষ্ট
পরাধীনতার কবল থেকে স্বাধীন হয়
''আমার স্বদেশ।''
১৭৫৭ সনে ২৩শে জুন
অধুনা ভারত ইতিহাস-এ ঘটে যুগান্তর
বাংলায় সিরাজ, ইর্স্টানেতে রর্বাট
হয় ''পলাশির যুদ্ধ''।
ব্রিটিশ শাসকরা শাসন করে শত বছর
কেটে গেল বছর বছর
কত উত্থান, কত পতন।
কত শত বিপ্লবী লড়ে প্রাণ পনে -
বিনয়-বাদল-দীনেশ আর ক্ষুদিরাম।
নেতাজী বলেন - ''তোমরা আমাকে রক্ত দাও,
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।''
তিলক বলেন - ''স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।''
কত শত বিপ্লবীর
রক্তে রাঙা
''আমার স্বদেশ'' খানি।

●

এর নাম কী জীবন

সুরজিৎ দুবে (প্রথম বর্ষ)

দুদিন আগে সকাল বেলা
দেখি চোখ খুলে
একটি ছেলে ভিক্ষা করে
একটি ছেলে খেলে।
একটু আগে খেলছিল যে
যায় সে চলে স্কুলে,
প্রথম ছেলেটি ভিক্ষা করে
মনের দুঃখ ভুলে।
ঐ ছেলেটি পায়না খেতে
পেটে ক্ষিদে সয়,
দুমুঠো ভাত পাবার জন্য
কত দুঃখ সয়।
মনে মনে সে দুঃখ করে
ভাবে ওদের নানা সুখ,
ওরা খায় দুধ, ভাত, মাছ
কেন মোদের পেটে ভুখ?

●

আমি এক পথিক

সুরজিৎ দুবে (প্রথম বর্ষ)

আমি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অনুসন্ধানকারী এক পথিক
অজানা রাস্তা চিরন্তন স্বপ্ন দেখে,
হিরকের সন্ধানে হিরণ্য জলে আমি।
চাঞ্চল্যের অস্থিরতা আর না পাওয়ার বেদনায়
অধির আগ্রহে একা একা পথ চলা।
চোখে রঙিন স্বপ্ন সামনে অস্পষ্ট বাধা
হেরে যাওয়ার যন্ত্রনায় থমকে দাঁড়ানো অপরাজিত আমি।
কুয়াশার ভোরে গাছের পাতায় লেগে থাকা শিশিরে
আলতোভাবে স্পর্শ করেছে বেদনা আমারে
দূরে প্রস্ফুটিত সূর্যের আলোয়,
নদীর জলে রামধনু মেলায়
আমার মন জুড়ায় শান্তির আশায়।
শান্তিতে আমি শান্ত নই,
স্বপ্ন আমি সাফল্য নেই।

•

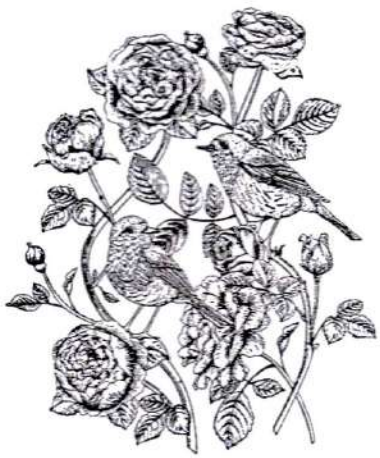

কবিতা

সোমনাথ দুলে (প্রথম বর্ষ)

কেউ কি জানে কী কারণে
কবিতা লিখি আমি,
এ জীবন থেকে হারিয়ে গেছে
যে ছিল খুব দামী।
নদীর ঢেউয়ে কান পেতে রই
মেঘের দিকে চেয়ে,
তাকিয়ে দেখি ঝর্ণা আমার
নামছে পাহাড় বেয়ে।
যখন তাকে কাঁদতে দেখি
পাহাড়ের ওই কোলে,
ওর কষ্ট আমার চোখে
উপছে পড়ে জলে।
তবুও তাকে বাঁচিয়ে রাখি
আমার কবিতায়,
তাইতো রোজই কবিতা লিখি
রাতের নীরবতায়।

•

অতীত স্মৃতি

সোমনাথ দুলে (প্রথম বর্ষ)

সেই নির্ঘুম রাত্রে একাকি দাঁড়িয়ে নক্ষত্রের প্রেমে পড়া
সেই পথ চলতি ব্যস্ততার মাঝে নিস্তব্ধ —
ছাতিম গাছটির প্রেমে পড়া
সেই বিকেলে নদীর পাড়ে বসে মাছরাঙার প্রেমে পড়া
শীতের ভোরে ওই দূর কুয়াশায় ঢাকা
পাহাড়ের প্রেমে পড়া
আজ সব অতীত লাগে বিষন্নতার ছোঁয়া জাগে
অনুভূতিরা সব ঢাকা পড়ে সময়ের ভারে
নক্ষত্রদের ঢেকে দেয় বেদনার কালো মেঘে
মরুর তলে শুকিয়ে গেছে কত সবুজের প্রাণ
হয়না বসা নদীর পাড়ে
হয় না প্রেমে পড়া
সবই আজ ঢাকা পড়ে
নীল কুয়াশার ভীড়ে।

মা

বরকত মোল্লা (দ্বিতীয় বর্ষ)

মা আমায় পৃথিবীতে দেখায় আলো
মা ছাড়া যে আমার জগৎ কালো।
মা এর কষ্ট কে বা আর বোঝে
মা এর স্থান যে হয় সবার উপরে।
ছোট বেলায় মা আমায় শেখায়
অ, আ, ক, খ বলতে
বড়ো বেলায় মা আমায় শেখায়
সবসময় ভালো রেজাল্ট করতে।
মা আমাকে তার স্নেহ আদরে করে বড়ো
আমি হয়নি তাই কারো কাছে জড়োসড়ো।
মা এর কাছে সন্তান সুখী চিরদিন
মা এর ঋণ পারবোনা মেটাতে কোনোদিন।

খেলাধূলা

সৌরভ বাউরী (প্রথম বর্ষ)

আমরা করি খেলা আর খেলা,
ভগবান যদি শেষ না হয় বিকাল বেলা।
খেলাতে আছে হার এবং জয়,
খেলার সময় করে একটু ভয়।
খেলা মানে লুডো সাপ,
তাতে পাবে অনেক চাপ।
জিতলে পাবে যতটা মজা,
হারলে ততটা পাবে লজ্জা।
খেলা মানে ছেলে বেলা করো না তোমরা হেলা,
ভগবান, যদি শেষ না হয় বিকাল বেলা।
খেলার মাঠে দেখবে তিনটি উইকেট,
তখন জমবে যে ক্রিকেট।
যখন খেলা হবে ফুটবল,
তখন দেখতে পাবে গোল আর গোল।

●

হাতিয়ার

মুকুল ঘোষ (প্রথম বর্ষ)

প্রশ্নকরণ জ্ঞানের দ্বার,
উত্তর জ্ঞানের আলো।
সঠিক প্রশ্ন,
করতে জানা ভালো।
কৌতুহলের জন্ম,
প্রশ্ন থেকেই আসে।
সঠিক প্রশ্ন,
নতুনের সৃষ্টিকে ভালোবাসে।
অন্ধকার দূর করে,
জ্ঞানের আলো।
সঠিক প্রশ্ন,
সকলকে না বলাই ভালো।
মনের দরজা খুলে,
জ্ঞানের আলো ঢোকে।
সঠিক প্রশ্ন,
জ্ঞানের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে।
সেই পথে এগোলে,
পাবে না তুমি হাতি।
সঠিক প্রশ্ন,
এই হাতিয়ারই তোমার সাথী।

●

বাবা

শান্তনু বাউরী (প্রথম বর্ষ)

যেদিন আমি ছোট ছিলাম
যুবক ছিলেন বাবা
সেদিনটি আসবে ফিরে
যায় কি তা আজ ভাবা?
বাবার কাছেই হাটতে শিখি
শিখি চলা বলা
সারাটি দিন কাটতো আমার
জড়িয়ে তার গলা।
বাবার হাতে হাতে খড়ি
প্রথম পড়া লেখা
বিশ্বটাকে প্রথম আমার
বাবার চোখে দেখা।
আজকে বাবার চুল পেকেছে
গ্রাস করেছে জ্বরা
তবু বুঝি বাবা থাকলেই
লাগে ভুবন ভরা।
বাবা এখন চশমা পরেন
পার করেছেন আশি
আজ তাকে আগের মতোই
অনেক ভালোবাসি

●

স্মার্টফোন

রাজীব বাঙ্গাল (প্রথম বর্ষ)

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ
টেলিফোন থেকে এল যে স্মার্ট ফোনের যুগ।
আমি যখন ছিলাম ছোটো
সবাই কার হাতে দেখতাম ফোন।
এখন আমি হয়েছি বড়ো
তবুও ভেবেছিলাম নেবো না ফোন।
করোনা ভাইরাস চীন থেকে এল যে নেচে নেচে
আমাদের দেশের ভূমিতে।
সরকার লকডাউন দিল যে এমন
স্কুল, প্রাইভেট হয়ে গেল বন্ধ।
অনলাইনে শুরু হল যে প্রাইভেট
কিনলাম আমি স্মার্ট ফোন।
এখন কি সরকার এল যে
ছাত্রছাত্রীদের দশহাজার টাকা দেওয়া।
খেলা হবে খেলা হবে কবে খুলল যে স্কুল
ক্লাসরুমে টিকটক করার ঝড়।
ভবিষ্যতের এই শিক্ষা ব্যবস্থা
নষ্ট করবে এই স্মার্ট ফোন।

●

সবুজ মন

অমিয় দুলে (প্রথম বর্ষ)

এ মায়াবি শহরে
কেহ বাধা নাহি পড়ে।
সবুজ এই মন,
তবুও খোঁজে এক নিবিড় আপনজন।
যা হয়তো মিলবে না
মিলবে না কোনোদিন।
বহে যায় সময়
তোমারে পাওয়ার আশা,
এ আশা ছাড়তে সে চায় না।
তবে সে আশাও যেন হতে থাকে ক্রমশ ক্ষীন,
পায় না সে ব্যাথা হারানোর কোনো ভাষা
ও যে অবুজ ও আজও রয়েছে তোমার অপেক্ষায়।

•

বৃষ্টি

অমিত বাউরী (প্রথম বর্ষ)

এই বৃষ্টিতে মাটি ভেজা গন্ধ।
আমায় করে দেয় মুগ্ধ
এই বৃষ্টি ভেজা রাতের আকাশ।
যেন বলছে আমায় বাতাস
শুনছি আমি, শুনছো তুমি
কানে কানে বলে যায় ওরা
আমিই যে বৃষ্টি আমাই যে সৃষ্টি
আমিই তো বিধাতা

•

প্রেমের কাহিনী

সৌভিক মিদ্যা (প্রথম বর্ষ)

তুই আমার রাতের তারা আঁধার ঘরের বাতি।
তুই আমার সারা জীবনের সুখ-দুঃখের সাথি।
মনে কর তোর আমার প্রথম দিনের কথা
কখনও তুই দিস নাকো আমাকে ব্যথা।
তুই যদি ভুলে যাস আমাকে
পারবো নাকো বাঁচতে আমি তোকে ছাড়া
যদি তুই কোনোদিন যাস হারিয়ে
সেদিন আমি চলে যাব ভুবন ছাড়িয়ে
সেদিন তুই ডেকে আমায় পাবি নাকো সাড়া
হয়ে যাব ঐ আকাশের ছোট্টো একটি তারা।

•

অসুখী

রাজীব বাঙ্গাল (প্রথম বর্ষ)

গোলাকার আকৃতির এই পৃথিবী
বসবাস করে কত প্রাণী।
চারপাশে রয়েছে সাতটি মহাদেশ
বসবাস করছে ধনী, গরীবের পরিবার।
ধনী পরিবারকে মম বলি সুখী
তবু কোনোদিক থেকে অসুখী।
গরিবদের পরিবারকে বলি অসুখী
কিন্তু কোনোদিক থেকে সুখী।
পৃথিবীর প্রতিটি পরিবারই সুখী নয়
কোনো না কোন ভাবে অসুখী।

•

একাকীত্ব

জয় চৌধুরী (প্রথম বর্ষ)

আমিও হতাম যদি ওই পাখিটির মতো
আমারও থাকত যদি ওই দুটো ডানা।
তবে তার সাথে পাল্লা দিয়ে উড়ে,
তাঁকে কী ধরা সহজ হত না।
ওই পাখিটিকে যদি পেতাম আমার খাঁচার ভিতর
তবে তাকে আদর করে খাওয়াতাম একমুঠো দানা।
প্রতিদিন স্নান করিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে দিতাম;
তা সত্বেও কী সে আমায় ধরা দিত না।
একলা রাতে ওই জ্যোৎস্না আকাশে,
তাঁকে জড়িয়ে ধরে আমি নিয়ে আমার পাশে;
গান গেয়ে, মাথায় হাত রেখে তারে ঘুম পাড়িয়ে দিতাম।
তবুও কী সে আমার কাছে থাকত না।
এই সব ভেবে ভেবে কতদিন পেরিয়ে যায়।
আমি জানালার পাশে বসে থাকি সেই পাখিটির আশায়।
তবুও সেই পাখি ধরা দেয় না আমায়।
তারে যত ডাকি, দূর আকাশে তত সে উড়ে চলে যায়।
সেই পাখিটির চিন্তায় আজ আমি মৃত্যুর দোরগোড়ায়।

সাদা সবার সেরা

উজ্জ্বল সাও (প্রথম বর্ষ)

সাদা দিয়ে শুরু জীবন
সাদা দিয়ে শেষ
সাদা মোদের সবার সেরা
সাদা মোদের বেষ্ট
সাদা দিয়ে শুরু আমার প্রথম খাওয়া দাওয়া।
তাই তো আমার অন্নপ্রাশনের সাদা নিশ্চয় সেরা।
তার পরেতে বড়ো হলাম, খিদে মিটল না ক্ষিরে
এরপরে আমায় খেতে হবে ভাত, মুড়ি আর চিড়ে
খাবার খেতে বসে দেখি এরাও বয়েছে সাদা রঙের ভিড়ে
খাবার পরে ইস্কুলে যায় সাদা ড্রেসটি পরে।
মা বলল সেলেট পেনসিল ব্যাগে নিস ভরে
লিখতে লিখতে হঠাৎ দেখি সাদা রংটি সরে।
মাষ্টারমশায় প্রয়োজনেতে চক ডাস্টার ধরে
বিকেলে যখন মাঠে খেলা করি,
আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি উঠছে কত সাদা রঙের সারি
এরই মধ্যে আমি পাড়ি দিলাম আমার নিজের বাড়ি
বাড়ি এসে খেলাম আমি দুধ আর মুড়ি
এই ভাবেতে কাটে দিন, কাটে প্রতি বছর
সাদা দিয়ে শেষ হবে আমার জীবন ভর
তাই আমি বলি সাদা দিয়ে জীবন শুরু
সাদা দিয়ে শেষ
তাই আমার কাছে সাদা রং ই বেষ্ট।

●

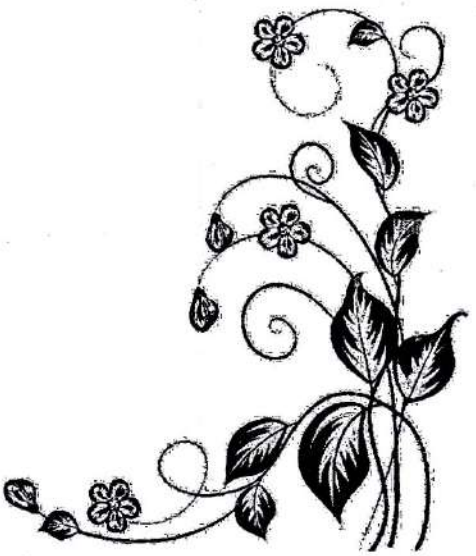

অমাবস্যা ও তারাপীঠ

উজ্জ্বল সাও (প্রথম বর্ষ)

পূর্ণিমার খবর সবাই রাখে।
অমাবস্যার কয়জন
পূর্ণিমাতে কেউ জাগে না
অমাবস্যার কথাই উঠে না
পূজো এলেই অমাবস্যা
কেউ বা বলে কালিপূজা
কালি, কালি বলি তাই
তারাপিঠে যেতে চাই
অমাবস্যাই জাগতে চাই
পূর্ণিমাকে বাই বাই
তারা মায়ের দর্শন পাই
তারা পিঠে আবার যাই
বড়ো মায়ের প্রসাদ খাই
অমাবস্যাই জাগতে চাই
জয় কালী, জয় কালী বলি তাই
আমার কাছে পূর্ণিমার মতো অমাবস্যার গুরুত্বও তাই
ভালো খারাপ নিয়ে থাকতে চাই
পূর্ণিমার সাথে অমাবস্যার ও খবর রাখতে চাই।

মা

সুমন মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

মা তুমি আশা দিয়ে ভাষা শিখিয়েছো,
দেখিয়েছো তুমি আলো।
সোহাগ দিয়ে ছেলের মতো
বেসেছো গো তুমি ভালো।
মাতৃ তুমি, জননী তুমি
আমার মা তুমি।
তোমার চরণে শতকোটি
প্রণাম জানাই আমি।
তোমার জন্য মানুষ হয়েছি
শিখেছি কথা বলতে।
তোমার হাতে হাতটি রেখে
শিখেছি পথ চলতে।
মা গো, তুমি প্রদীপ হয়ে
জ্বলছ আমার মনে।
তুমি দিয়েছ ভালোবাসা
পেয়েছি প্রতিটি ক্ষণে।
মানুষ হয়েছি আমি
তোমার আঁচলে।
সেসব কথা রাখব মনে
যাবো নাকো ভুলে।

আমি

চিন্ময় মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমি কে, আমি কি আমি নিজেকে কেন চিনতে পারছি না
কেন আমার মনে হচ্ছে আমি দিনের পর দিন ব্যর্থতার দিকে
এগিয়ে যাচ্ছি।
আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও কেন নিজেকে
প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না।
কেন আমি প্রতিবার প্রতিষ্ঠার দোরগড়ায় গিয়েও আবার
পেছনে ফিরে তাকাতে হচ্ছে।
কেন আমি পরিবারের দিকে তাকিয়েও নিজেকে সেই জায়গায়
নিয়ে যেতে পারছি না।
জানি না জীবনে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারব কি না
তা আমার ভিতর থেকে প্রতিদিনই ডাক দেয়।
কিন্তু নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে পরিশ্রম
দরকার তা আমি কেন দিতে পারছি না জানি না
এর জন্য কারন কী তা আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না।
জীবনের বাকি যে কটা দিন রয়েছে তা জানি না
কীভাবে কোন পথ ধরে আমি এগিয়ে যাব।

•

ফিরতে চাওয়া

শুভজিৎ মহাপাত্র (প্রথম বর্ষ)

পড়লে মনে লাগে অবাক
যেন ছেলেবেলা শুধুই দিচ্ছে ডাক।
এই বুঝি হলো সকাল
খাঁচারূপী গাড়ি ধরতে এল।
অবলাদের নিয়ে গেল
করতে মানুষ আর সুশৃঙ্খল।
অবলারা শুধুই ভাবে হয়েছি আটক
এ ফাঁদ হতে নেই কি কোনোই ??
তাইতো তারা মনে মনে করে যুক্তি
কোনোভাবেই পাবো নাকো মুক্তি।
হয়েছি আজ আমরা মুক্ত
তবুও ছেলেবেলার স্কুলের রয়েছি ভক্ত
হাসি কান্না আর খেলার এক একটা রঙিন দিন
আমাদের কাছ হতে আজ হয়েছে বিলীন।
ভাবছি আমি মনে যেমন
ভাবছিস কি তোরাও তেমন।
মায়ের কাছে বকা খেয়ে যেতাম আমি স্কুল
বন্ধুরা বলে আমরা তো আছি ভয় কি তোর বল।
নেইকো আজ দেখা সেই রঙিন দিন
হয়েছে লোকের কাছে তা স্মৃতিচারণের দিন।
তাইতো মন শুধুই চায় ফিরতে স্কুল
যদিও জানি সময়ের টানে পাবো না ফিরে
আর ছোটোবেলার স্কুল।

●

বৃষ্টি-বাদল

কৌশিক ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)

আজকে বড়োই সুখের দিন
আসছে আবার বৃষ্টির দিন।
মাঠ থৈ থৈ করবে জলে
পুকুর নদী উঠবে ফুলে।
মাছগুলি সব করবে খেলা।
জলের আনন্দে।
ভগবানের কি সৃষ্টি
সারা বেলা এত বৃষ্টি।
আকাশ হবে ঘন কালো
পড়বে ঝরে বৃষ্টিগুলো।
চাষিরা সব আসবে মাঠে
লাঙল নিয়ে কাঁধে।
করবে চাষ করবে খেলা
ফসল ফলাবে সারাবেলা।

●

ইচ্ছে

কৌশিক শতপথী (দ্বিতীয় বর্ষ)

ইচ্ছে ছিল লেখক হবার, কিন্তু ছন্দের অভাব কিছু
মনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা আমায় করে দিয়ে অসমর্থ।
তবু আমি ছন্দের অভাব পুরন করার জন্য প্রকৃতিকেই ভালোবেসে ফেললাম।

পড়লাম প্রকৃতির প্রেমে! কিন্তু তবু পেলাম না সঠিক ছন্দের সন্ধান। তারপর একদিন আমি তোমায় ভালোবাসলাম তাও পেলাম না সঠিক ছন্দের সন্ধান, কিন্তু আর তুমি নেই তোমার অভাব দিয়েছে আমায় ছন্দের ঝুড়ি। এখন আমার গল্প সবাই পড়ে আমার ইচ্ছের সমাপ্তি ঘটে কিছু অজানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে।

লিখি আমি কবিতা এখন চলেছে আমার কলম।
এখন আর একা নাই সঙ্গ হয়েছে সেই সুরের পুরোনো সেই লেখালেখিটা। আজ এসেছে আমার কলমের ডগায়,
যা ভাবি তা ফুটে উঠে কবিতা রূপি বাস্তব জীবনের পাতায়।

লিখেছি অনেক কবিতা আজি অনেক কবিতা খাতার পাতায়,
ফুটিয়েছি অনেক বাস্তবতা আজ কাব্য শেষের অন্তিম পাতায়।
উপলব্ধি করেছি আজি স্মৃতি গুলি বন্দি আজ
ব্লক লিস্টে আর ইচ্ছে গুলো স্ট্যাটাসে।

●

আমার প্রিয় কবি

কৌশিক শতপথী (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমার প্রিয় কবি,
রবীন্দ্রনাথ, মানে সাহিত্যের দেবতা
রবীন্দ্রনাথ মানে সর্বসৃষ্টির ক্ষমতা।
রবীন্দ্রনাথ মানে, সাহিত্যের অর্জুন
রবীন্দ্রনাথ মানে, বাঙালির মনে বসন্ত আর ফাল্গুন।
রবীন্দ্রনাথ মানে, ভানুসিংহের পদাবলী।
রবীন্দ্রনাথ হলেন তিনি, যিনি বেঁধেছেন সুরের তাল
শুনেছি রবি ঠাকুরের লেখা কালজয়ী সব গান।
বাংলা সাহিত্যকে যিনি দেখিয়েছেন আলোর পথ
দেশে বিদেশে ছুটিয়েছেন তার রচনার জয়রথ।
বাঙালি মানেই রবীন্দ্রনাথ,
বাঙালি মানেই কবিগুরু
বাঙালি মানে বুঝিতে শুরু,
বুঝিতে শেষ।
বাঙালিকে তিনি কি দিয়েছেন ??
দিয়েছেন অনেক গর্ব।
ওহে অমর কবিগুরু, তব শ্রী চরণে
আমি বারে বারে করি প্রনাম।

●

স্বাধীনতা

সুমন্ত রথ (দ্বিতীয় বর্ষ)

আগে ছিল পরাধীন,
বন্দি ছিল সারাদিন।
স্বাধীনতা আনতে গিয়ে
গেল ক্ষুদিরাম।
ফাঁসি দিল তাকে
কিন্তু রইল তার দাম।
বাজি ফাটল দুমা দুম
উড়িয়ে দিল সবার ঘুম
দেশে দেশে স্বতেজতা
এবার এল স্বাধীনতা।
এবার এল ভালো দিন,
সবাই বলো জয়হিন্দ।

●

চাওয়া পাওয়া

সাহেব মল্ল (দ্বিতীয় বর্ষ)

বিশ্বভুবনের মক্ত দরবারে
তোমার-আমার মস্ত চাওয়া;
দুঃখের প্রতি ক্ষোভ আমাদের
সুখ-আনন্দের আশায় রওয়া।
গরীব মানুষ সর্বদা চায়
বিলাস বহুল জীবনযাপন
কিন্তু সে যে, বড়ই অবুঝ
"বিলাসিতাই কি পরম ধন?"
শৈশব থেকে যৌবনেতে
অবশেষে বার্ক্য পর্যন্ত
মানুষ বড়ই অদ্ভুত জীব
নেয় তার চাওয়া পাওয়ার অন্ত।
বলল হঠাৎ সময় আমায়
থমকে দাঁড়িয়ে, পেছনে ডেকে
জীবনটা তো বৃথাই গেলো
চাওয়া পাওয়ার মস্ত ফাঁকে !
আমরা সবাই মটির কাছের জীব,
সারাজীবন মাটির মাপেই রই;
চাওয়া পাওয়া ছোট হতে যত
জীবন হবে ততই মানান সই।

•

হামদের ভাষা - হামদের গরব

তরুণ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

ভাষা কি আজ শিখা যায় লিখাপড়া কইরে?
উট্যা ব্যাতের জবান, যার মুহে যেমন সরে।
হামরা মানভূইমা বটি; আইজ্ঞা
ই ভাষাটাই ফুটটে আছে ডি-ডহরে।
'হ্যাঁ' বলতে নাই পারি, বুক চিতায় বলি 'ই'
ম্যানতেক ইটাও তো বাংলা ভাষাই বটে ন?
'মা' কে বলি মাই, 'না' কে বলি নাই
স্বাদ লয় আইজ্ঞা, সুয়াদ আছে হামদের ভাষাটাই।
বাপ-দাদার মুহে রাতকহনি শুইনেছি ই ভাষাতে
গরব কইরে ঝ্যুমুর জুইয়েছি আখন সাঁকরাতে -
"চ্যাং গড়গড় আইসকা পিঠা
বঁধুর পিরীতে বেড়ে মিঠা
সদরে কইরো না বঁধু, পিরীত কর আড়ে
পরান বিঁধছে হামার মনচোরার কাঁড়ে।"
ই ভাষাতেই ভবপ্রীতা, সিন্ধু বালার ঘুঙুর রিনিঝিনি
লরাতর লে নদীঘাট তক্ক, এই একটা ভাষাই চিনি।

•

হৃদয় গহীনে তোমার শূন্যতা

বাপন লায়েক (প্রথম বর্ষ)

তুমি নেই বলে, লক্ষ- কোটি মানুষের ভিড়ে আমার একাকীত্ব
তারা ভরা আকাশে চাঁদের মত একা।
তুমি নেই বলে, গ্রাস করে আমায় শূন্যতা।
দেবদাস এর মত যেন জীবন গাথা।।
তুমি নেই বলে, ভেঙে গেছে সকল আশা-প্রত্যাশা।
দুঃখ কষ্টের ভারে হয়েছি পথ হারা।
তুমি নেই বলে, জাগে না প্রেম এ হৃদয়ে গহিনে,
তুমি তুমি করে সর্বহারা হয়ে, পড়ে আছি শুধু স্মৃতি টুকু নিয়ে।
তুমি নেই বলে, বসন্তেও আজ ফুল ফোটে নি,
হৃদয়টা হয়েছে শুকনো মরুভূমি।

●

যত মত তত পথ

তন্ময় বাউরী (দ্বিতীয় বর্ষ)

যেমন করে মানুষ ছাড়ে তাদের মাটির বাড়ি
তেমনি করেই ... মৃত্যুর পর মানুষ ছাড়বে তাদের দামি গাড়ি।
যেমন করে আকাশ ছাড়ে বাড়ি।
সময় ছাড়বে আমায় আমি জানি।
যেমন করে অলস তাদের শুয়ে বসে দিন কাটছে।
অমানুষ গুলো মানুষ হতে গীতার পাতা পড়ছে।
বলবে আমি অনেক জানি, অনেক আমার শক্তি।
অনেক আমি ভগবান মানি, অনেক আমার ভক্তি।
এই অনেক অনেক করেই মানুষ ছোট্ট জিনিসগুলো
এমন করে এড়িয়ে চলে যেন গাড়ির কাঁচের ধূলো।
আচ্ছা তুমিও মানুষ আমিও মানুষ ... এটাই হত যদি,
যদি মোবাইল খানা খুললেই দেশের নাগরিক হতে পারো।
তবে তুমি কেন বাড়িতে বসে মাথার উকুন মারো।
আমি জানি তুমি পারো।
তুমি যদি মন্ত্রী হতে তুমিও নিজের হাতে বাড়ি করতে পারো।
তোমার গ্রামের একশোটা লোক ভাবতে অনেক সোজা।
যখন তুমি রাজ্য চালাবে কত মানুষ বোঝা।
তোমার গ্রাম হয়তো খাবার পাবে তোমার মন্ত্রী আসনে গিয়ে।
অনেকেই সেই রাস্তায় শোবে, মন্ত্রীকে গালি দিয়ে।

●

ধ্বংস

অমিত কুণ্ডু (প্রথম বর্ষ)

ভেবে ভেবে যখন সকাল থেকে দুপুর
দিগন্ত বিস্তীর্ণ আলোর রেখা টুকু মুছে গেল।
দিনে হাজারো লোক মরছে, হাজারটি শিশু জন্ম নিচ্ছে।
কেউ সারা জীবন বিলাসে কাটাচ্ছে।
কেউ দারিদ্রে পীড়িত হচ্ছে।
খুন আত্মহত্যার লাইন লেগে আছে।
প্রকৃতি তার রোজগার বাঁধাধরা নিয়মে চলছে
বৃদ্ধ মানুষেরা তাদের স্মৃতি রোমন্থন করছে।
এই তো জীবন; আনন্দ দুঃখ আরও নানা কিছু নিয়ে
তারপর একদিন হারিয়ে যাওয়া।
এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীটাকে কত
ছোট বলে মনে হয়।
এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্র নশ্বর জীব মানুষ।
যা খুশি মানুষ তাই করুক তারপর
আর সবকিছুর মতোই ধ্বংস হয়ে যাক।

●

তুমি আসবে বলে

সুমন সরেন (দ্বিতীয় বর্ষ)

তুমি আসবে বলে
অপেক্ষায় আছি বাস ট্রেনে
একটি বার তোমায় দেখার জন্য
কতনা বাস ছেড়েছি
শেষ বাসেও ঘর ফেরা হয়নি
তুমি আসবে বলে

তুমি আসবে বলে
বাগানের ফুলগুলি এখনো ঝরে যায়নি,
ফুলের সুগন্ধ উড়ে যেতে দিয়নি
তুমি আসবে বলে।
বাগানের ফুলগুলি ঝরে গেল
ফুলের সুগন্ধ হারিয়ে গেল
তবুও তুমি এলে না কেন?

তুমি আসবে বলে
কতনা গল্প সাজিয়ে রেখেছি
কতনা প্রশ্ন মনের ভিতর জমিয়ে রেখেছি,
তুমি শুনে উত্তর দাওনি কেন?

তুমি আসবে বলে
রাত জেগে কতনা স্বপ্ন সাজিয়ে রেখেছি,
কত না দিন, কত না মাস গুনেছি,
আমি রেখেছি হিসাব
তুমি কেন রাখোনি হিসাব?
আমি যেমন তোমার অপেক্ষায় আছি
তুমিও কি আমার অপেক্ষায় আছে।

●

এ্যয়েম্বকেশ্বরে কয়েকদিন

মনোজ কুমার পাণ্ডে (Lec-in-Charge)

সকাল ৭.০০ টা নাগাদ ব্রাশ নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে যে দৃশ্য দেখলাম অভিভূত হয়ে গেলাম। এত মনোমুগ্ধকর সে দৃশ্য যে, না দেখলে বোঝা যাবে না। ঠিক ১০০-১৫০ মিটার দূরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাহাড়ের শুরু এবং বর্ষার মেঘ পেঁজা তুলার মতো পাহাড়ের মাথাগুলো ঢেকে রেখেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, পূর্ব দিকে সূর্য উঠেছে, তার সোনালী রোদ, পাহাড়ের কাছে কচি গাছপালার সবুজ গালিচার মতো আস্তরণকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সামনে অন্তত ৫-৬টা ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছি। যেগুলো থেকে অনবরত জল পড়ছে। জায়গাটা হল মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার অন্তর্গত এ্যম্বকেশ্বর জ্যোর্তিলিঙ্গের নিকটবর্তী একটি সাধুগোষ্ঠীর আশ্রম। এ আশ্রমের তাঁবুতে আমাদের আশ্রয়স্থল। এসেছি কুম্ভমেলায় স্নানের উদ্দেশ্যে। গত ২৪শে আগষ্ট বাড়ি থেকে বেরিয়ে খড়গপুরে ট্রেন ধরলাম বিকাল ৪টা নাগাদ। সঙ্গে আছেন আমার ভগ্নিপতী এবং উদাসীন সন্যাসী সংঘের একজন শাখা সংঘের প্রধান। তাঁর সহকারী কয়েকজন অনুগ্রাহী এবং ২১টি ঢাক সহ ২১ জন ঢাকী। এই সন্যাসী সংগঠন সম্বন্ধে আমার বিশেষ একটা জানা নেই। তবে স্বামীজীর ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা বেশ ভাল। ট্রেন খড়গপুর থেকে ছাড়ার পর ঝাড়গ্রাম, টাটানগর, চাকুলিয়া হয়ে চলতে লাগল। ভিতরে সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। আর বাইরে প্রবল বৃষ্টি। গাড়ি চলতে থাকল তীব্র গতিতে। ট্রেনের কামরার সহযাত্রীরা কুম্ভমেলা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ । তারা মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে চলেছে তাদের কর্মক্ষেত্রে। এরা বিভিন্ন ধরনের শিল্পী। কেউ জরির কাজ করে, কেউ সোনার কাজ করে, কেউ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে ডেকোরেশনের কাজ করে। এদের কর্মক্ষেত্র মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর, যেমন - থানে, ভূসাওল, জলগাঁও, মুম্বই, পুনে। বছরে একবার বা দুবার বাড়ি আসে। বাড়িতে পড়ে থাকে তাদের মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান আর তারা দিনের পর দিন পরবাসে কষ্ট করে জীবিকা অর্জন করে যায়। সবাই খুব যে সুখে আছে তা নয়। তাদের কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই। কখনো ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয়, কখনো বা ২৪ ঘন্টাই করতে হয়। কয়েকজন স্বর্ণ শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তারা প্রথমে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করেছিল। সেখানে মালিকের ফাই ফরমাশ খাটতে হতো। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে কাজ, দেখতে দেখতে বছর দুয়েক পরে কাজ শিখে যায়। একজন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। প্রথমে কটকে, পরে দিল্লীতে এখন করে জলগাঁওতে। একজনের সঙ্গে পরিচয় হল সে ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর কাজ করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে গনেশ পূজা উপলক্ষ্যে ফুল দিয়ে ডেকোরেশনের কাজ করে। ভালোই উপার্জন করে। এইভাবে সহযাত্রীদের

সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম। ২৫ তারিখ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। আসলে ট্রেনে ভালো ঘুম হয় না। ট্রেন তখন ছত্রিশগড় এর কোন স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। এরপর সারাদিন ধরে ট্রেন ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে চলল। রাস্তার দুপাশে বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখতে দেখতে চলেছি। জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল কোথাও ধান, কোথাও ভুট্টা, জোয়ার, কিংবা কোথাও ডাল জাতীয় শস্য। কোথাও আবার শুধুই উষর জমি। দুপুরের পরেই ট্রেন মহারাষ্ট্রে ঢুকে গিয়েছিল। আগের কয়েকটি স্টেশনে খুব সস্তায় আপেল বিক্রি হচ্ছিল। বাঁকুড়ার দামের প্রায় অর্ধেকের চেয়ে কম দামে। বর্ষাকাল হওয়ার জন্য রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সবুজ আর সবুজ। বিকেলের দিকে ট্রেন যখন এই সবুজ ফসলের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছে, দেখতে পাচ্ছি জমিতে বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন ধরনের হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। কোথাও বা জমির মাঝে ময়ূর চরে বেড়াচ্ছে-অপরূপ দৃশ্য। আমাদের যাত্রার নেতা হলেন সন্তদাস বাবাজী। তিনি সমগ্র পথ মাঝে মাঝে এসে আমাদের খবরাখবর নিয়ে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে তার সেবক গনেশকে দিয়ে খাবার পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য। কখনো লুচি, আলুর দম, বোঁদে। কখনো লুচি, বোঁদে বা মুড়ি বোঁদে। বাড়ি থেকে মা আবার করে দিয়েছিল, ব্যবহার করাই যাচ্ছিল না। ভাবছিলাম মা এত কষ্ট করে করে দিলেন যাতে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকটা খাবার ফেলে দিতে হল। ২৫ তারিখ রাত্রি ১২.৩০ নাগাদ আমরা পৌঁছেছিলাম নাসিক স্টেশনে। আমি ভেবেছিলাম সকাল পর্যন্ত স্টেশনে কাটাতে হবে। কিন্তু তা হল না। আমাদের জন্য আশ্রমের গাড়ি অপেক্ষা করছিল। এখানে গাড়ি বলতে ত্রিপল এর ছাদযুক্ত ছোট ট্রাক। তাতে আমরা মানে আমার সঙ্গী, সাধু সন্তদাস বাবাজী, তাঁর আরো কিছু শিষ্য এবং ২১ জন ঢাকী ঢাক সহ সবাই মিলে ৩৭ জনের একটি দল। রাতের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ট্রাক ছুটে চলল আমাদের গন্তব্য স্থলের দিকে। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে আমরা একটা বড় আশ্রমের কাছে পৌঁছালাম। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। চারিদিক একদম ঝকমকে এবং বিজলী বাতির কল্যাণে ঝলমলে। পাহাড়ের ছোট একটা টিলা কেটে তার উপরে আশ্রম বানানো হয়েছে। আশ্রমের ঠিক মাঝামাঝি সুন্দর, মার্বেল পাথরে সজ্জিত একতলা একটি মন্দির। মন্দিরের তিনদিকের পূর্বদিকে চারতলা অতিথিশালা, দক্ষিন দিক এবং পশ্চিমদিক বরাবর একতলা, অতিথিশালা, অফিস, রান্নাঘর।

উত্তরদিকেও একতলা ঘর আছে ওখানে মন্ত্রপাঠ যজ্ঞ ইত্যাদি হয়। একটি কোনে আছে সুন্দর বাঁধানো জাল দিয়ে ঘেরা বড় ইন্দারা। আশ্রমের পাশে পাহাড়ের ঢালে তৈরী করা অস্থায়ী খাবার জায়গা, যেখানে একসঙ্গে প্রায় ৭০০-৮০০ জন খাবার খেতে পারে। রাস্তার যে পাশে আশ্রম তার বিপরীতে পূন্য স্নানার্থীদের জন্য এক বিশাল তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেটি তৈরি হয়েছে লোহার খুঁটি এবং টিন দিয়ে।

আমরা যখন পৌঁছালাম অর্থাৎ ২৫ তারিখ রাত্রি ১-৩০ নাগাদ তখন তাঁবুতে কয়েকজন সাধু জেগে আছেন। আমাদের জন্য তাঁবুর একটা প্রান্তে থাকার ব্যবস্থা হল। সেখানে পলিথিন সীট এর উপর মাদুর বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। সারারাত্রি ভাল ঘুম হওয়ার ফলে পথের ক্লান্তি অনেকটাই দূর হয়েছে। আমি এবং আমার সঙ্গী ঠিক করলাম নাসিক শহরটা ঘুরে আসব। কিন্তু তার আগে আমরা সন্তদাস বাবাজীর কাছে অনুমতি নেবার জন্য আশ্রমে উপস্থিত হলাম। এখানে এসে দেখি 'ধ্বজারোহন' নামক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। কুম্ভমেলা চলে ১ মাসের কিছু বেশি সময় ধরে। এই ১ মাসের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ তিথি পড়ে যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী ... ইত্যাদি। ঐ তিথি গুলিতে সাধুদের বিশেষ স্নানের আয়োজন হয়। ঐ স্নানকে শাহীস্নান বলে। নাসিক কুম্ভমেলাতে ৪টি শাহীস্নানের তিথি আছে। আমরা যে শাহীস্নান এর জন্য এসেছি সেটি রাখীপূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হবার কথা - সেই তিথিতে স্নানের জন্য গিয়েছি। ঐ উপলক্ষ্যে আশ্রমে ঐ 'ধ্বজারোহন' অনুষ্ঠান হচ্ছে। এখানে ৩টি খুব লম্বা এবং মোটা কাঠের গুঁড়ি যুক্ত করে লম্বা দণ্ড তৈরি করা হয়েছে। শায়িত সেই দণ্ডকে ভাল করে কয়েকজন মিলে কাপড় দিয়ে মুছে দণ্ডটিকে নতুন লাল কাপড় দিয়ে আবৃত করা হল। অন্যদিকে মাইকে ব্রাহ্মনেরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছিলেন। একই সঙ্গে প্রবল পরাক্রমে দুইজন ঢাকী যারা আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল তারা ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছিল। চারিদিকে প্রচুর ভক্ত ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ কয়েকজন ক্যামেরাম্যান ছবি তুলে যাচ্ছিলেন। বহু জনের হাতে ছিল উন্নত মোবাইল। i-Pad, Tab প্রভৃতি। যার সাহায্যে তারা ওই মুহূর্তটিকে বন্দি করতে চাইছিলেন। চারিদিকে প্রচুর পুলিশ। আমরা বাবাজীর অনুমতি নিয়ে এবং পুলিশের কাছে জেনে নিলাম বাসস্ট্যাণ্ড কোন দিকে এবং কীভাবে যেতে হবে। আশ্রমে তখন পুরোদমে চলছে ধ্বজারোহনের সমারোহের প্রস্তুতি। আমাদের সঙ্গে যে ঢাকের দল গিয়েছিল তারা বাজিয়ে যাচ্ছে। ওখানকার মানুষ ঢাক সম্পর্কে অতটা পরিচিত নয়। যার ফলে ঢাকিরা খুব বাহবা পাচ্ছিল।

পরিষ্কার বাঁধানো রাস্তা দিয়ে আমরা চললাম বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে। এ্যম্বকেশ্বর একটি ছোট্ট শহর, মূলত শিবের মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এখানকার বসতি। এখানে শিবের মন্দিরের চারপাশে উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। মন্দিরটি কালো পাথর দিয়ে তৈরি। মূল মন্দিরের তিনটি অংশ। মন্দির প্রাঙ্গনের পাশে আছে কুশাবর্ত তীর্থ যেখানে গোদাবরী নদী এবং অহল্যা নদী মিশেছে। এই কুণ্ড হয়ে দুটো নদীর মিলিত স্রোত বেরিয়েছে, যার নাম গোদাবরী নদী, আমরা বৃষ্টিস্নাত ঢালাই রাস্তা অতিক্রম করে মন্দির থেকে প্রায় ১/২ কিমি দূরে বাসস্ট্যাণ্ড এ এসে পৌঁছালাম। পুলিশ কন্‌স্টেবল আমাদের বলেছিল নাসিকগামী বা মালেগাঁওগামী বাস ধরতে।

আমরা বাসস্ট্যাণ্ড এ যেয়ে নাসিকগামী একটি বাসে চেপে বসলাম। ফাঁকা বাস চলছে হু হু করে। রাস্তার পাশে পাশে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন আশ্রম, কুম্ভমেলার জন্য তাঁবুও পড়েছে বেশ কিছু। রাস্তার দুদিকে কিছুটা দূরে পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে-এগুলো পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশ। এই পাহাড়গুলো ক্ষয়জাত পাহাড়। এখানকার পাহাড়গুলো একটু অন্যরকমের। সাধারণত পাহাড় চুড়োগুলো তীক্ষ্ন হয় কিন্তু এই পাহাড় গুলোর মাথাগুলো যেন কাটা, দেখলে মনে হয় পাহাড় নয় যেন উঁচু দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের এই ধরনের আকৃতির প্রভাব পড়েছে দক্ষিণভারতের মন্দির শৈলীতে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলো ঠিক এরকম চুড়াকাটা পাহাড়ের মতো, যেমন রামেশ্বরমের মন্দির। আমার মনে হয়, মানুষ মনে করত পাহাড় হল দেবতার আশ্রয়স্থল সেজন্য যেমন পাহাড় দেখত মন্দির ঠিক সেইভাবে তৈরী করত। রাস্তায় যেতে যেতে একটা পাহাড় দেখলাম, যার আকৃতি হুবহু বৌদ্ধ স্তুপের মতো। বাস যত এগিয়ে চলল দুপাশে চোখে পড়ল অঙ্গুরের ক্ষেত। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলাতে প্রচুর আঙ্গুরের চাষ হয়। সেজন্য এখানে কিসমিস খানিকটা সস্তা। আঙ্গুরের ক্ষেতগুলি অনেকটা কুঁন্দরীর মাচার মতো। দূর থেকে প্রথম দর্শনে মনে হবে ওটা কুঁন্দরীর মাচা, আসলে তা হল আঙ্গুরের মাচা। এ্যম্বকেশ্বর থেকে নাসিক ২৬ কিমি রাস্তা, ভাড়া ৩৬ টাকা। এখানে বাসের ভাড়া পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি। মহারাষ্ট্রের পরিবহন ব্যবস্থা সরকারী বাসের ওপর নির্ভরশীল, প্রাইভেট বাস চলে না বললেই চলে। নাসিক শহর বেশ বড়। আমাদের গন্তব্যস্থল হল রামঘাট। এটি গোদাবরী নদীর তীরস্থ গুরুত্বপূর্ণ সেই ঘাট, যেখানে শাহীস্নান অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ২০০৭ সালে আমরা সপরিবারে নাসিক এসেছিলাম বেড়াতে। সেই হিসাবে নাসিক শহর সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে। এ্যম্বকেশ্বর থেকে বেরিয়ে গোদাবরী এখানে খানিকটা চওড়া হয়েছে। রামচন্দ্রের যখন বনবাস পর্ব চলছিল তখন লক্ষণ এবং সীতাকে নিয়ে তিনি এখানে উপস্থিত হন এবং এখানেই ছিল পঞ্চবটী বন। পৌরাণিক গল্প অনুসারে এখানে শূপর্নখা এসে প্রথমে রামকে, পরে লক্ষনকে প্রেম নিবেদন করে, ফলস্বরূপ লক্ষনের হাতে তার নাক কাটা যায়, সেজন্য এ জায়গার নাম নাসিক। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই বন মুনি-ঋষিদের তপস্যাস্থল ছিল। এখান থেকেই রাবণ একদিন সীতাকে হরণ করে। সেই বন কেটে গড়ে উঠেছে জনবসতি এবং আজকের নাসিক শহর। এখনও গোদাবরী তীরে জঙ্গলের কিছুটা অংশ আছে, যেখানে একটি মন্দিরকে বলা হয় শ্রীরামপর্ণকুটীর। সেখানে রামের পর্ণ কুটীর ছিল, একটা গুহা আছে, সেটা বলা হয় যে, রাম, লক্ষণ যখন পশুশিকার করতে যেতেন তখন সীতাকে সেই গুহাতে লুকিয়ে রাখতেন। পঞ্চবটী বনের সংলগ্ন এলাকাকে তপোবন বলে। বহুকাল ধরে বহু সন্ন্যাসী, সাধু, মহাত্মা যুগ যুগ ধরে তপস্যা করত এই স্থানে। পঞ্চবটী সংলগ্ন, গোদাবরীর ঘাটের নাম

'রামঘাট'। 'নাসিক কুম্ভমেলার' প্রধান কেন্দ্র। এখানে নদীর ঘাট সুন্দর ভাবে বাঁধানো। নদীখাত অপ্রসস্ত সেইজন্য যাতে অনেক লোক একসঙ্গে স্নান করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নদীর দুই তীর বরাবর অনেকটা অংশ সিঁড়ির ধাপ করে বাঁধানো হয়েছে। হরিদ্বারে ''হর-কি-পৈড়ী' এর ঘাট যেমন করে বাঁধানো এখানেও সেই একইভাবে করা হয়েছে। আমরা CBS থেকে অটোতে করে রামঘাটে পৌছালাম। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নীচে সিঁড়ি পেরিয়ে ঘাট। চারিদিকে বেশ কিছু পুলিশ, মেলার কাজে নিযুক্ত। মেলা ভিড় সামাল দেবার জন্য পরিকাঠামো তৈরী হচ্ছে, আজ ২৬শে আগষ্ট, শাহী স্নান হবে ২৯শে আগষ্ট, সেজন্য ভিড় অনেকটা কম। নদীর ঘাট এর কাছে এসে আমরা দেখলাম বহু লোক স্নান করছে। সময় বেলা ১১টার কাছাকাছি রোদও ভালো আছে। এছাড়া দ্বিতীয়বার এখানে আসার অনিশ্চয়তার কথা ভেবে আমাদের স্নান করার ইচ্ছে হল। কিন্তু সমস্যা গামছা আনা হয়নি। ঘাটের উপরে দোকানে খোঁজ করতে করতে একটা দোকান থেকে গামছা কিনলাম। দোকানদার এর কাছ থেকে জানা গেল ২৯শে আগষ্ট ১ম শাহী স্নান এবং ঐদিন নাসিক এবং এ্যম্বকেশ্বর দুই জায়গাতেই শাহী স্নান হবে। সাধারণত শৈবপন্থী সাধুরা এবং যাদের এ্যম্বকেশ্বর স্থায়ী আশ্রম আছে তারা এ্যম্বকেশ্বর-এ তাঁবু তৈরী করে, এবং শাহী স্নান দুই জায়গাতে হবে। একথা শুনে মন কিছুটা শান্ত হল। এরপর আমি এবং আমার সঙ্গী একে একে স্নান করলাম। এই সময় ২০০৭ এর স্মৃতি ভেসে উঠল। সেই সময় ঘাট খুব ফাঁকা ছিল, ১৫-২০ জন স্নান করছিল। আজকে প্রায় কয়েক শত লোক স্নান করছে। স্নান করতে যেয়ে বাবার কথা মনে ভেসে উঠল। সেইবার বাবা সঙ্গে ছিলেন, বাবা ছিলেন আমাদের নেতা। আজ বাবা নেই, প্রায় দুবছর আগে ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। স্নান করতে নামলাম। জলে নেমে স্নান করে বাবা এবং বোনের উদ্যেশে তর্পন করলাম। জল থেকে উঠেই 'গোদাবরীর' মন্দির প্রনাম করে রামঘাট থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তার অপর পারে একটু উঁচুতে 'কপালেশ্বর' শিবের মন্দির। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এখানে নন্দীর মূর্তি নেই। এই মন্দির সম্পর্কে আরো অনেক কথা আছে। বাবার মুখে শুনেছি আজ আর মনে নেই। স্নান করায় পিঠের দিকটা চুলকাছিল-অর্থাৎ নদীর জলে দূষণের মাত্রা একটু বেশি আছে বোধ হয়। মন্দির থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে দোকান গুলোতে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করছে - গামছা, মাদুর, রুদ্রাক্ষ, কিসমিস ... আরো কত কি। আমরা কিসমিস কেনাতে উৎসাহী ছিলাম। আসলে নাসিক-এ আঙ্গুর প্রচুর হয়, সুতরাং কিসমিসের দাম অনেক কম হওয়া উচিত। কিন্তু তা নয় বাঁকুড়ার দামের থেকে খুব একটা কম নয়। নাসিক খুব পুরানো শহর। এখানে একটি অশোকের স্তম্ভ আছে এবং তাতে অশোকের বানী খোদাই করা আছে। এর থেকে মনে হয় সম্রাট অশোকের

আমলেও নাসিক একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল। নাসিকস্থিত অশোকস্তম্ভের আর একটি গুরুত্ব আছে। সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে অশোকের লিপি আছে। সেই সেই লিপির রচনাকার কে কিংবা কোন রাজার কথা লেখা হচ্ছে, তা পরিষ্কার করে কোথাও লেখা নেই। সবজায়গায় পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'প্রিয়দর্শী' হিসাবে। ঐতিহাসিকরা যখন এ বিষয়ে খোঁজ শুরু করেন তখন তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন, কে এই 'প্রিয়দর্শী'। একমাত্র নাসিক লিপিতে এই ধাঁধার উত্তর আছে। এখানে বলা আছে সম্রাট অশোই হলেন 'প্রিয়দর্শী'। গতবারে এসেছিলাম কিন্তু সেইবার অশোক স্তম্ভ দেখা হয়ে উঠেনি। এবার ভেবেছিলাম অশোকস্তম্ভ দেখব। রামঘাটে স্নান করে, একটা দোকানে আলু বড়া কিনে খেলাম। আলু বড়া আমাদের আলুর চপের মতোই। মহারাষ্ট্রে পাও-বড়া, বড়া-পাও ইত্যাদি খাবার পাওয়া যায়। পাওবড়া হল পাউরুটি সঙ্গে বড়া, Salted কাঁচা লঙ্কা। দু পিস পাউরুটির মধ্যে আলুর পুর ঢুকিয়ে বেসন লাগিয়ে ভেজে দেওয়া হয়। আর পাও-বড়া হল দুটি গোল পাউরুটি এবং সঙ্গে আলু বড়া, এর সঙ্গে লবনাক্ত সেদ্ধ কাঁচালঙ্কা। খেতে খুব খারাপ লাগে না। যাই হোক আলু বড়া খেয়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করে নদীর পুল পার হলাম। তারপর দোকানদারদের জিজ্ঞেস করতে করতে প্রায় ১$^{১}/_{২}$ কিমি চলার পর এলাম একটা স্তম্ভের কাছে। লোকে বলছে এটাই অশোক স্তম্ভ। রেলিং দেওয়া চৌকা ধরনের ফুট দশেক লম্বা একটা থাম, যার মাথায় অশোক স্তম্ভের চারটি সিংহ মুখ লাগানো আছে। স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে ৪০-৫০ বছর আগে কোন মন্ত্রী, এটা স্থাপন করেছিলেন। হতাশ হয়ে গেলাম, কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করলাম তারা আসল অশোক স্তম্ভের ঠিকানা দিতে পারল না। হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলাম। এদিকে আমার সঙ্গীর এসব বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ নেই। আমরা আবার রামঘাটের কাছে এলাম, উদ্যেশ্য তপোবনে যাওয়া। তপোবন হল বন যেখানে প্রাচীন কালে মুনি ঋষিরা তপস্যা করত। বর্তমানে এখানে বন নেই, ফাঁকা জায়গা, এবং সেখানেই বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন তাঁবু তৈরী করেছে, কুম্ভমেলাতে ভক্তদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। ২০১৩ তে আমরা এলাহাবাদ এ কুম্ভমেলায় গিয়েছিলাম সেখানে গঙ্গার চরে বিস্তৃত জায়গাতে তৈরী হয়েছিল তাঁবু। চারিদিকে ছিল তাঁবু আর তাঁবু আর মানুষের সমুদ্র। এখানে জায়গা কম, তাঁবু কম, লোকও কম, যদিও আজ অর্থাৎ ২৬শে আগষ্ট শাহীস্নানের তিনদিন পূর্বের কথা বলছি। পরের দিনগুলিতে লোক আরো বাড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই সেইজন্য প্রশাসন শক্তপোক্ত ব্যারিকেড তৈরী করছে, মানুষের চাপ আটকানোর জন্য। এর আগে এখানে ২০০৩ সালে কুম্ভমেলা হয়েছিল। সেইবার বাবা, মা এসেছিলেন। মা ফিরে যেয়ে কুম্ভমেলার প্রসঙ্গে বলে ছিলেন, যে ওখানে তাঁবুগুলিতে পূণ্যার্থীদের মিষ্টি, লাড্ডু, পায়েস বিভিন্ন খাদ্য বিলি করা হয় প্রচুর পরিমানে। আমি তো কিছুই দেখতে পারছিলাম

না। অটোওয়ালা আমাদের তপোবনে নিয়ে এসে বলল, বাবু এখানে খাওয়া ফ্রি। আমরা নেমে দেখলাম বিভিন্ন তাঁবু থেকে খাদ্য বিলি করছে। খিদেও পেয়েছিল, আমরাও খাবার নিলাম এবং খিদে মেটালাম। কিছুটা তপোবন ঘুরলাম, অনেক তাঁবু পড়েছে কাছাকাছি ঘেঁসাঘেসি, মাঝে মাঝে রাস্তা আছে, আছে toilet এর ব্যবস্থা। আরও অন্যান্য ব্যবস্থা করেছে। তপোবনে সারি সারি তাঁবু, অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। তাঁবুর পর তাঁবু বিভিন্ন রং এর বিভিন্ন রকমের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই তাঁবু। কিন্তু তবুও মন ভরছে না, মনে হচ্ছে যেন পুরো সিনেমার ট্রেলার দেখছি। ২০১৩ সালে গিয়েছিলাম প্রয়াগে কুম্ভমেলায়। কি বিশাল তার রূপ! এক বিরাট এলাকা জুড়ে বসেছিল এই মেলা। আমার কাছে সঠিক হিসেব নেই। তবে আমার মনে হয় ৫-৭ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার এলাকা জুড়ে মেলাটা বিস্তৃত ছিল। চারিদিকে শুধু জনসমুদ্র। মেলাতে জনসংখ্যা বাড়ে শাহীস্নানের আগের দিন। চারপাশের এলাকা থেকে লোক কাতারে কাতারে আসতে থাকে। এই সব মানুষ বেশীরভাগ সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। মাথায় থাকে বোঁচকা কিংবা সাধারণ ব্যাগ। একজন দুজন অথবা পুরো পরিবার হাঁটতে হাঁটতে মেলাতে চলে আসতে দেখা যায়। বাবা, মা, ছেলে, ছেলের বউ-নাতি চলেছে পূণ্যস্নান করতে। কত বয়স্ক মানুষ কারো কারো বয়স ৮০-৮৫ বছর, হাঁটতে পারছে না তাও কিন্তু ছেলের ঘাড়ে চেপে চলেছে স্নান করতে। কতশত মানুষ কেউ হয়ত অসুস্থ, কেউ হয়ত পঙ্গু হাঁটতে পারছে না তবুও চলেছে কুম্ভস্নানের উদ্দেশ্যে। সুতরাং সেই বিশাল মেলার সাপেক্ষে। নাসিকের মেলা প্রাঙ্গন অনেক ছোট লাগছে যদিও, আজ অর্থাৎ ২৬শে আগষ্টের ৩ দিন পর শাহীস্নান। এই নিয়ে আমি ৩নং কুম্ভমেলাতে এলাম। এর আগে ২০১০ সালে হরিদ্বার এবং ২০১৩ সালে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) কুম্ভমেলাতে গিয়েছিলাম। যতই কাজ থাক, ঠিক সময় ছুটি বের করে মেলাতে চলে অসি। এবারে যেমন অনেক অসুবিধা ছিল। (১) কোথায় থাকব তার সঠিক ব্যবস্থা ছিল না - যে কোনোভাবে সেই ব্যবস্থা হয়ে গেল (২) ট্রেনে ৪ মাস আগে রির্জাভেশন হয়ে গেছিল, কিন্তু শেষের দিকে এত কাজের চাপ ছিল যে মেলাতে আসতে পারব ভাবিনি-কিন্তু হয়ে গেল, এসে গেলাম মেলাতে। তপোবনের সামান্য কিছুটা জায়গা দেখে আমরা ফিরে এলাম। কারন আমাদের ফিরতে হবে এ্যম্বকেশ্বর। আমরা বাসস্ট্যাণ্ড-এ এসে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের বাস পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান ফারাক হল পশ্চিমবঙ্গের ৯০ শতাংশ বাস বেসরকারি আর ওখানে ১০০ শতাংশ বাস সরকারি। নাসিক শহর খুব বড়, তার সঙ্গে রয়েছে কুম্ভমেলা-এর জন্য বাসের সংখ্যা অনেক। মুর্হুমুহু বাস আসছে বাস স্ট্যাণ্ড-এ তারপর বিভিন্ন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে। এ্যম্বকেশ্বর এর বাস পেতে প্রায় ২০ মিনিট লেগে গেল। বাসে বসে নাসিক শহর মধ্যে আসার সময়ে,

গতবারের স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলাম। জানলার পাশে বসে শহরটাকে দেখে সেবারের দেখা জায়গাগুলো খুঁজবার চেষ্টা করছিলাম, খুঁজে পেলাম না। ৮ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মারাঠীদের জাত্যভিমান প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি এবং তা অনেক সময়ে মানবিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাজঠাকরে, উদ্ধব ঠাকরেদের চেলা চামুণ্ডাদের অত্যাচারের কাহিনী জানি, কিন্তু এখানে বাস কন্ট্যাক্টটরের আচরণ অবাক করল। একজন বয়স্ক (সিনিয়ার সিটিজেন) তীর্থযাত্রীর কাছে ভাড়া চাইতে গেলে, তিনি কনসেশন চান, এর উত্তরে কন্ট্রাক্টর বলেন মহারাষ্ট্রে শুধু মারাঠীরাই এই সুযোগ পাবেন। আপনি মারাঠী নন সুতরাং আপনি কনসেশন পাবেন না। রাস্তার দুপাশে আবার সেই সুন্দর পাহাড়। দুপুর বেলাতে নাসিকে গরম লাগছিল, কিন্তু যত এ্যম্বকেশ্বর এর দিকে চলেছি তত আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসছে -খুব সুন্দর একটা অনুভূতি। প্রকৃতির অদ্ভুত খেলা, নাসিক থেকে এ্যম্বকেশ্বর দূরত্ব মাত্র ২৬ কিলোমিটার কিন্তু দুই জায়গাতে তাপমাত্রা অনেক পার্থক্য-নাসিক গরম, এ্যম্বকেশ্বর আর্দ্র, ঠাণ্ডা, আসলে এখন বর্ষাকাল, মেঘ এসে পশ্চিমঘাট পর্বতে ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এ্যম্বকেশ্বরে নিয়মিত বৃষ্টি হয়। অথচ নাসিকে বৃষ্টি হয় না। এ্যম্বকেশ্বর অঞ্চল প্রায়ই মেঘে ঢাকা থাকে। বিকেল ৪টা নাগাদ বাসস্টপ এ নেমে চললাম, আমাদের তাঁবুর সন্ধানে। রাস্তায় তীর্থযাত্রীর সারি এবং পুলিশের লাইন। বাঁকুড়া থেকে নাসিক অনেকটা পশ্চিমে, যার ফলে এখানে বেশ খানিকটা দেরীতে সন্ধ্যা হয়। এবং সকাল হয় দেরী করে। আমরা কিছুটা পেয়ারা কিনে নিলাম। আপেল বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু সস্তা না হওয়াতে কিনলাম না। তাঁবুতে ফিরে এলাম। এ্যম্বকেশ্বর জায়গাটা বড় সুন্দর। সকালটা যত ভালো লাগে, বিকেল এবং সন্ধ্যেটাও তাই। এবং এর সৌন্দর্যের আসল কারীগর হল পাহাড়। সন্ধ্যাকালীন চা পান করে, মন্দিরের দিকে এগোলাম। মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি চলছিল। সন্ধ্যের কিছু পরে আমরা তাঁবুতে বসে আছি। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম আলোচনা করছে। সকালে আমরা যখন এসেছিলাম তাঁবুর বেশির ভাগটাই ফাঁকা ছিল। এখন বেশ খানিকটা ভরে গেছে। বেশির ভাগ হচ্ছে সাধু। এরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। বিশেষ করে উত্তর ভারত থেকে। সাধুদের পোশাক বিভিন্ন বর্ণের কালো, গেরুয়া, কারো লাল, কারো বা সাদা বর্ণের। এই বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণ আমার ঠিক মতো জানা নেই। ভাবলাম পরের দিন কোনো সাধুকে জিজ্ঞেস করে নেব। সাধুরা কেউ গল্প করছেন, সঙ্গের সঙ্গী বা সঙ্গীনির সাথে, আবার কেউ শুয়ে আছেন, কেউ কেউ গাঁজা খাচ্ছেন। এরই মধ্যে সন্তদাসজী এসে পরামর্শ দিলেন, পরের দিন ভোর ৪টা নাগাদ এ্যম্বকেশ্বর মন্দিরে যাতে পুজো দিতে যাই তা নাহলে বেলাতে প্রচুর ভিড় হবে। আমরা মানে আমি, ভগ্নীপতি স্বপন দা, এবং আরো একজন সঙ্গী ভোর ৩টে নাগাদ উঠে পড়লাম। রাত্রে ভালো বৃষ্টি হয়েছে,

যার জন্য শীতভাব ছিল। এদিকে আমার আবার ঠাণ্ডাতে এলার্জি আছে। সুতরাং কি করব আমি ভাবছি-স্বপনদা বলল হাত-পা, মুখ ভালো করে ধুয়ে জামাকাপড় বদলে নিতে। ওরা স্নান করলেও, আমি স্বপনদা পরামর্শ মেনে নিলাম। এরপর বেরিয়ে পড়লাম এ্যম্বকেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এ্যম্বকেশ্বর হলেন জ্যোতিলিঙ্গ, প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থস্থান। সময় ভোর ৪টার কাছাকাছি রাস্তা একদমই ফাঁকা, রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে তার জল হাইড্রেন দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম মন্দিরটা মনে হয় একদম ফাঁকা পাওয়া যাবে। মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখলাম পূজা দেবার লাইন পড়ে গেছে-বেশ লম্বা লাইন। আমরা একটা জুতা খুলে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম এত ভোরেও বহু মানুষ পুজা দিতে এসেছেন। এদের মধ্যে অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরাও আছেন। লাইনের পাশে বাচ্চাবাচ্চা মেয়েরাও ফুল বিক্রি করছে তার মধ্যে বিভিন্ন পাহাড়ীফুল ইত্যাদি। আমরা ১০ টাকা করে ফুল এবং পুজাসামগ্রী কিনে লাইন ধরে এগোতে লাগলাম। মন্দিরের গেটে রক্ষী, ফুলের থলি নিয়ে নিল এরপর একটা ফুলের ঝুড়িতে ফুলগুলো ঢেলে দিল। ঐ সঞ্চিত ফুল পরে পুজোর জন্যই কাজে লাগানো হবে। আমরা লাইন ধরে মন্দিরের নাট মন্দিরে ঢুকে পড়লাম, জায়গাটা প্রশস্ত এবং ভিড় ঠেকাবার জন্য ভেতরে লোহার রেলিং দিয়ে লাইন করা আছে। মন্দিরের রং কালো, কালো পাথর এর খণ্ড দিয়ে তৈরী, খুব সুন্দর কারুকার্য করা। মারাঠা পেশোয়া বালাজী বাজীরাও, বর্তমান মন্দির তৈরী করান। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের পাদদেশে ত্রিশ্বক শহরে মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরে স্থাপত্যশৈলীকে বলা হয় 'হেমাদ্রীপন্থী' শৈলী। কালো পাথরের এবং চুন দিয়ে তৈরী এই মন্দিরশৈলী এয়োদশ শতকে বিকশিত হয়। দেবগিরি এর 'যাদব' রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হেমাদ্রী পণ্ডিত। যিনি নিজে একজন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট ছিলেন এবং তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি হল 'হেমাদ্রীপন্থী' শৈলী। এই মন্দিরের অধীশ্বর মহাদেব 'এম্ব্যকেশ্বর'। এটি হল জ্যোতিলিঙ্গ। শিব পুরান অনুযায়ী একবার ব্রম্ভা বিষ্ণুর মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। তখন মহাদেব স্বর্গ, মর্ত্য, এবং পাতালকে তিনটি আলোর স্তম্ভে পরিণত করেন। ব্রম্ভা, বিষ্ণু চেষ্টা করেন আলোক স্তম্ভ খুঁজে পাবার। ব্রহ্মা মিথ্যা কথা বলেন, তিনি রহস্য খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু বিষ্ণু নিজের হার স্বীকার করেন তখন মহাদেব, ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন, যে মর্ত্যলোকে তাঁর পুজা করার লোক পাওয়া যাবে না। বিষ্ণুকে আশীর্বাদ দেন সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত লোকে বিষ্ণুকে পুজা করবে শিব নিজের জ্যোর্তিময় স্তম্ভের আকারে প্রকাশিত হয়। তাই তিনি জ্যোর্তিলিঙ্গ, সারা ভারতবর্ষে ৬৪টি জ্যোর্তিলিঙ্গ আছে, তার মধ্যে ১২টি জ্যোর্তিলিঙ্গ খুব পরিচিত। এ্যম্বকেশ্বর তার মধ্যে একটি।

প্রায় ৩০-৪৫ মিনিট ধরে লাইনে ঘোরার পর আমি পৌছালাম গর্ভগৃহের দরজাতে। বিশাল

দরজা, দরজার কাঠে বিভিন্ন সময়ের ভারতীয় মুদ্রা আঁটা আছে। গর্ভগৃহ প্রশস্ত সেখানে ব্রাহ্মনেরা এবং তাদের সহকারীরা পুজোর বন্দোবস্ত করছেন। গর্ভগৃহের মাঝামাঝি জায়গাতে শিবলিঙ্গের যোনীপীঠ এবং তা গোলাকৃতি এর মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। লিঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় না। লিঙ্গের জায়গাতে তিনটি অসমরেখ গর্ত আছে। পুজোর সময় দুধ ঢালা হলে তিনটি ছোট গর্ততে দুধ জমা থাকে যার ফলে দরজা থেকে যোনীপিঠের ভিতর তিনটি সাদা বিন্দুর মতো লাগে। বিন্দু তিনটি ব্রম্ভা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলে। গর্ভগৃহের ভিতরে পুজোর আয়োজন চলছিল। বেশ কয়েকজন লোক সম্ভবত ব্রাহ্মণ ভিতরের কাজ গুলি গুচ্ছাছিল। আমি গর্ভগৃহের দরজার সামনে ৫-১০ সেকেণ্ড দাঁড়াবার পরেই পিছন থেকে নিরাপত্তা রক্ষীর গলা ধাক্কা খেয়ে সরে যেতে হল। আমরা যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন ওই ভোরের আলো ফুটেনি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে তাঁবুতে এসে পৌঁছালাম। তাঁবুর ভিতরে তখন বেশীর ভাগ পূণ্যার্থীই নিদ্রিত। আমি শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য। বেশ কিছুক্ষণ পরে সবাই যখন উঠে পড়েছে। তখন আমাদের বাকী সঙ্গীরা যখন আমাদের নৈশ অভিযানের কথা জানতে পারল। তখন তারা আপশোষ করতে লাগল। সকালে খাবার তাঁবুতে চা খেতে গিয়ে জানা গেল আজ সকাল ১০টা নাগাদ শোভা যাত্রা বেরোবে। সঙ্গে উদাসীন গোষ্ঠীর বিশেষ শোভাযাত্রাও বেরোবে এবং তাতে সবাইকে থাকার জন্য কথা বলে দিলেন সন্ত দাস জী।

এখনকার আবহাওয়া বিচিত্র ধরনের। আমরা আছি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশে। এখন বর্ষাকাল, মেঘগুলো সব ভেসে ভেসে এসে পাহাড়-এ ধাক্কা খাচ্ছে। কিংবা আটকে থাকছে, সারাদিন মেঘলা, মাঝে মাঝে সূর্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, রাত্রের দিকে বেশীর ভাগ কিংবা দিনের বেলাতে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে আবহাওয়া খুব মনোরম। সকালের দিকে ঠাণ্ডা লাগছে। অথচ নাসিকে বৃষ্টি নেই। আমরা মুখ ধুয়ে সকালে বেরোলেই বেশ কয়েকটা জায়গা থেকে জলখাবার পাওয়া যেত। প্রধান ভোজনালয় ছাড়াও কয়েকটা জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের জল খাবার যেমন সুজি, খিচুড়ি, ঘুগনি, পায়েস, বিস্কুট, চা ইত্যাদি। সকালের জলখাবার খেয়ে আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ে ওঠার রাস্তার দিকে চলে গেলাম। প্রথমে পাহাড়ে চাপার জন্য তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু চাপতে গিয়ে মনে হল এগিয়ে যাই। আসলে পাহাড়টা খুব খাড়া, আমরা তাঁবু থেকে কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম, খাড়া দেওয়ালের মতো পাহাড়, আর সারাদিন ধরে পিঁপড়ের সারির মতো লোক উঠছে নামছে। পাহাড়ের অপর পৃষ্ঠে রয়েছে গোদাবরীর মন্দির। এই পাহাড়ের অনেক গুলো ঝরনার জল একত্রিত হয়ে একই নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এখন বর্ষাকালে, বৃষ্টি হলেই ঝরণার দেখা মেলে, তাঁবু থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম অনেক ঝরনা। আমরা পাহাড়ে

চড়তে লাগলাম। আজকে আকাশে মেঘ কম আছে মাঝে মাঝে রৌদ্র বেরিয়ে চারিদিক ঝিকমিক করছে। আমি High Blood Pressure এর রোগী heart এর একটু সমস্যা আছে। একটানা সিঁড়ি চাপলে কষ্ট হয় তাই ভাবছিলাম পাহাড়ে চাপবো না। কিন্তু সকালের মনোরম পরিবেশ এবং অনেক লোক যাচ্ছে দেখে আমিও এগিয়ে চললাম। পাহাড়ে চাপার সিঁড়িগুলো ও বাঁধানো এবং পাশে লোহার রেলিং দেওয়া। বেশ কিছুটা করে চাপার পর সিঁড়ির পাশে ছোট ছোট দোকান আছে, দোকানে জলের বোতল, চা, পাউরুটি, কেক, লজেন্স, চকোলেট বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও পাহাড়ে চাপার জন্য ছড়িও বিক্রি হচ্ছে। ভাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড়ে জঙ্গল, জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের গাছ, আম, জাম ও বটগাছও রয়েছে, রয়েছে আরও কত নাম না জানা গাছ কত বিভিন্ন ধরনের লতা গুল্ম সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। রাস্তার পাশে পাশে সরুলোহার স্ট্যাণ্ড এ গোল টিনের পাত লাগানো তাতে পাহাড় সংলগ্ন বনে কি কি পাখি পাওয়া যায়। তার সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে। যতটা ভেবেছিলাম, পাহাড়ে চাপতে কষ্ট কিন্তু ততটা কষ্ট হচ্ছিল না। যদিও পাহাড়টা অসম্ভব খাড়া, তবু রাস্তা এমনভাবে তৈরী যে ততটা কঠিন অনুভব হচ্ছিল না। সঙ্গে জলের বোতল আনিনি, জল তেষ্টাও পেয়েছে। আমরা এক জায়গাতে একটা দোকানে বসে পকোড়া, চা খেলাম এবং জলের বোতল কিনে আবার চলতে লাগলাম। রাস্তায় বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের মানুষ বেশি। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলের মানুষ হিন্দীও জানে না। যার ফলে তারা অনেক সময় কি ভাষায় কথা বলছে তাতো বোঝাও যাচ্ছিল না। আমাদের হিন্দীও বুঝতে পারছিল না। আমরা এগিয়ে চললাম। যত উপরে উঠছি পাহাড়ের দৃশ্য তত মনোরম লাগছে। উপর থেকে গোটা এ্যম্বকেশ্বর ক্ষেত্রটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উপর থেকে এ্যম্বকেশ্বর মন্দির ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলি বড় সুন্দর লাগছিল, মনে হচ্ছিল ছবির মতো সব কিছু সাজানো আছে। যত উপরে উঠছি ততই যেন শহরের ছবিটা ছোট হয়ে সম্পূর্ণভাবে চোখে ধরা দিচ্ছে। রাস্তার পাশে পাশে মাঝে মাঝেই ঝরণা দেখা যাচ্ছে। যদিও তার ধারা খুব চওড়া নয়, এরই মধ্যে মেলাতে নিযুক্ত মহারাষ্ট্র পুলিশের কিছু পুলিশ যারা এই এলাকাতে কর্তব্যরত তাদের মধ্যে যাদের বয়স বেশ কম, যেমন ২৫-২৬ এর মধ্যে তারাও পাহাড়ে চাপছে। কেউ দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি চাপছে, হাতে বড় বড় স্ক্রীনের মোবাইল কোনও কোনও ঝরণার পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুলে নিচ্ছে। সিঁড়ির পাশের দোকানগুলোতে দোকানদারেরা নিজেদের থাকার ব্যবস্থাও করেছে। তবে নীচের দিকে যারা থাকে তারা নীচের সমতলে নেমে যায়। অন্যান্য দিন পাহাড়ের গায়ে বেশি মেঘ জমে থাকে। কিন্তু আজ ঐ লেবেলে মেঘ দেখা যাচ্ছে না। আমরা আরো চাপতে লাগলাম। যত ওপর দিকে যাচ্ছি পাহাড় তত খাড়া হচ্ছে। সিঁড়ির ধাপগুলোতে

জল পড়ে পিছল হয়ে গেছে। সিঁড়ির ধাপগুলো ক্রমশ ওপর দিকে উঁচু ওঠে গেছে। এক একটা সময় মনে হচ্ছিল আমার পক্ষে চাপা অসম্ভব। আমার শারিরীক অবস্থার কথা ভেবে বারে বারে শঙ্কিত হচ্ছিলাম। বহুদিনের সিঁড়ির ধাপ, যার বেশ খানিকটা করে ভেঙে গেছে, একেকটা জায়গা সুড়ঙ্গের মতো লাগছে। ধৈর্য্য করে আস্তে আস্তে হাতের লাঠিতে ভর করে একটা সময়ে ওপরে উঠে গেলাম। ওপরে সিঁড়ির পাশে একটা চা এর দোকান, এখানে চা ছাড়াও আরো অন্যান্য দ্রব্য যেমন টোস্ট, বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাবার, জলের বোতল বিক্রি হচ্ছে। আবার ঐ দোকান, দোকানদারের পরিবারও থাকে, কিছুটা ওপরে, পাহাড়ের ঢালে অনেকগুলো গাই, গরু, মোষ চরতে দেখা গেল, সম্ভবত এই পরিবারেই গবাদী পশু। ভেবেছিলাম এখানেই বোধ হয় শেষ, কিন্তু ওখানে যেয়ে দেখলাম, আরো কিছুটা ওপরে ওঠলে তবে যে পাহাড়টাতে ওঠছিলাম তার চুড়াতে ওঠা যাবে। তবে মাঝখানে সামান্য কিছুটা সমতল জায়গা। রাস্তার পাশে কয়েকটি কিশোরী বসে পাহাড়ী বেগুনি রংয়ের ফুলের মালা, এবং ফুল বিক্রি করছে। ফুলগুলো বেগুনি রংয়ের তবে হালকা বেগুনি মালা ছাড়াও খুচরা ফুল ও বিক্রি করছে, পাতার থালাতে, ১০ টাকা করে দাম। পাহাড়ের অপর ঢালে গোদাবরীর মাতার মন্দির আছে। এছাড়া বেশ কিছুটা দূরে একটি শিব মন্দিরও আছে। অনেকে পুজো দেবার জন্য ফুল কিনছে। আমরা এগিয়ে গেলাম। এরপর ওঠার সিঁড়ি নেই, পাহাড়ি পথ ধরে ওপরে ওঠতে হচ্ছে। একটা সময়ে কষ্ট করে আমরা পৌঁছে গেলাম ঐ চুড়াটার একদম মাথায়। চুড়াতে পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্য ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢুকে গেলাম, Visibility খুব কম, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান জলের কণাগুলো মাথা হালকা করে ভিজিয়ে দিল, একটু পরে চারিদিক পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে ওটা কুয়াশা নয়, মেঘের স্তর মধ্যে পড়ে গেছিলাম আমরা। মেঘেদের ভিজিয়ে দেবার গল্প, বাবার মুখে বর্ষার দার্জিলিংয়ের গল্পে শুনেছিলাম, আজ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ক্ষয়জাত, যার ফলে চুড়াগুলো তীক্ষ্ন নয় বরং দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের মাথাগুলো কেউ যেন সুতীক্ষ্ন তরবারী দিয়ে কেটে দিয়েছে শুধু ধড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় যেন খাড়া দেওয়ালের মতো পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ কেটে যাবার পর সূর্যের আলোতে চারিদিক ঝলমল করে ওঠল। পাহাড়ের পশ্চিমপ্রান্তে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। ছোট বড় বিভিন্ন পাহাড়ের সারি। পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা ঝর্ণাগুলো এক একটা জলপথ তৈরী করে নীচে নেমে গেছে। কখনো আবার কয়েকটি জলপথ এক জায়গায় মিলিত হয়ে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের জলাশয় তৈরী করেছে। ওপর থেকে যতদূর চোখ যায়, পাহাড়ের পূর্ব এবং পশ্চিমপ্রান্ত এর কম বেশি কয়েকটা জলাশয় চোখে পড়ল। এদের মধ্যে পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে নাসিক শহরের দিকে একটি বেশ বড় জলাশয় চোখে

পড়ল। পাহাড়ে পশ্চিম ঢালে রয়েছে গোদাবরীর মন্দির, বেশ কিছু পূণ্যার্থী লাইন দিয়েছে মন্দিরে পূজো করার জন্য। জায়গা অপ্রশস্ত, পুজোতে দেরী হবে দেখে আমরা আর পুজোর জন্য লাইন দিলাম না। এই জায়গাটাকে গোদাবরী নদীর উৎসস্থল বলে। এখানে অবশ্য কোনো জলাশয় দেখতে পেলাম না। তবে বিভিন্ন কয়েকটি ঝরণার স্রোত এখানে মিলিত হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। মূল মন্দির থেকে একটু উঁচুতে বিষ্ণুর একটি ছোট মন্দির আছে। গোদাবরী মন্দির থেকে অন্তত দুই কিলোমিটার দূরে একটি শিবের মন্দির আছে। অনেক লোক পুজো দিতে যাচ্ছিল-আমাদের অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাঁবুতে গেলে খাবার পাব কিনা এই ভাবনাতে আর যাওয়া হল না। আমরা নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম।

পাহাড়ে উতরাই, চড়াইয়ের চেয়ে সহজ, তবে সব জায়গায় নয়, যেখানে পাহাড় অনেক বেশি খাড়া, সেখানে নামা, চড়ার চেয়ে বিপদজনক লাঠি ধরে ধরে ধীরে ধীরে নামতে হচ্ছিল, পিছল ছোটো ভাঙা সিঁড়ি, পেছনে সারি সারি লোক একই সঙ্গে উঠছে, নামছে এই অবস্থায় একটু অসাবধান হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। খাড়া অঞ্চলটা পেরিয়ে যাবার পর যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নামবার চেষ্টা করছিলাম, কারণ বেলা হয়ে গিয়েছিল, দেরী হয়ে গেলে আবার তাঁবুতে খাবার পাওয়া যাবে না। যেখান থেকে লাঠি ভাড়া নিয়ে ছিলাম সেখানে লাঠিগুলো ফেরত দিলাম। নামার সময়ে সিঁড়ির ধারে ধারে টি স্টল গুলোতে ভুট্টা পুড়িয়ে বিক্রি করছিল, আমরা কিনে খেয়ে তো অবাক, ভুট্টার দানাগুলো বেশ বড়বড়, নরম এবং সুমিষ্ট অপূর্ব।

তাঁবুতে ফিরতে প্রায় বেলা আড়াইটা বেজে গেছিল। রোদ বেশ চড়া, একই সঙ্গে তাঁবুর কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ম কানুন বেশ কড়াকড়ি - আমাদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক দেরী হবার জন্য খাবার পাওয়া যাচ্ছিল না, তাদেরকে অনেক বুঝিয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা সম্ভব হল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাজারের দিকে আজকের আমাদের লক্ষ্য আইডেনটিটি কার্ড তৈরির জন্য ফটো তোলা, ঐ আইডেনটিটি কার্ড তাঁবুর কর্তৃপক্ষ তৈরী করে দেবে। এর ফলে কুম্ভস্নানের দিন বিভিন্ন রকমের অসুবিধা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম শহর ঘুরতে। আমি ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না কুশবর্ত কুণ্ডটা ঠিক কোনটা? এর আগের বার অর্থাৎ ২০০৭ সালে যখন যখন এ্যম্বকেশ্বর গিয়েছিলাম তখন মনে হয়েছিল কুশবর্ত কুণ্ড মন্দির লাগোয়া, কিন্তু ভোরে যখন মন্দিরে এ পুজো করতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু কুশাবর্ত কুণ্ড খুঁজে নাই নি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে অন্য একটা কুণ্ডের কাছে এলাম বটে। কিন্তু সেটা গৌতম কুণ্ড, এদিকে মেঘ করেছে, সন্ধ্যাতে ওই গুঁড়ি গুঁড়ি পায়ে নেমে আসছে। এখন পাহাড়টাকে কালো মনে হচ্ছে বা লাগছে।

মনে হচ্ছে কালো রং এর মাথা কাটা দেওয়ালের সারি দাঁড়িয়ে আছে আর সেই দেওয়ালের মাঝে মাঝে আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দেখা যাচ্ছে। আসলে পাহাড়ে চাপার রাস্তার পাশে কিছু কিছু চা, জলখাবারের দোকান সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারও থাকে। তাদের কুটির গুলোতে জ্বলে ওঠা আলো। কালো পাহাড়ের Back ground এ কালো পাথরের তৈরী এ্যম্বকেশ্বরের মন্দিরকে আরো কালো লাগছে। রাস্তায় তখনো লোক আসছে, আস্তে আস্তে ছোট মন্দির শহর এ্যম্বকেশ্বর, লোকে ভরে ওঠছে, আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। তাঁবুতে সাধুদের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করছে। বিভিন্ন রকমের সাধু আছে, অনেকের আবার শারীরিক অবস্থা খব একটা ভালো নয়। মনে হয়, এরা খুব সাধারণ মানুষ, দারিদ্রতা এদের সর্বঅঙ্গ জুড়ে প্রকাশিত। হয়ত সারা বছর ধরে ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বর্তমান কালের মানুষ খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক, সমাজ সম্পর্কে উদাসীন, তাদের কাছে ধর্ম বলতে বোঝায় , অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণা করা, এবং অপরকে সেই কাজে উৎসাহিত করা। নিজেদের ছোটো ছোটো সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গীভূত করে ফেলা এবং সেই সম্প্রদায়ের তথাকথিত ভণ্ড বাবাদের চরণে পয়সা ঢালা। অদ্ভুতলাগে আজকের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে কিভাবে ছোট, ছোট সম্প্রদায়ে ভাগ করে। অন্যদেরকে ঘৃণা করা রপ্ত করে নিয়েছে। আজকের সাধারণ মানুষ ভিখারিকে ভিক্ষা দেয় না। অসহায়কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। ফলস্বরূপ আজকের দিনে সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা করে জীবন ধারণ খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এখানে যে সাধুরা এসেছে, এবং তাঁবুতে আছে তারা অধিকাংশই অপুষ্টির শিকার, অপুষ্টিজনিত কারণে শরীর ভেঙে গেছে। কিন্তু সাধুর সঙ্গে তাদের সঙ্গীনীও এসেছে। সাধুদের একটা বদ অভ্যোস হচ্ছে গাঁজা খাওয়া। সন্ধ্যে থেকেই তাঁবু গাঁজার ধোঁয়াতে ভরে উঠছে। এরপর সারারাত এরা কাশতে থাকবে আর পাশে থুতু ফেলতে থাকবে। সারারাত এই কাশির দমকে এদের তো ঘুমোই আসে না, আমাদের মতো মানুষদের অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। কুম্ভমেলা মূলত সাধুদেরই মেলা। এখানে কুম্ভস্নানে সাধারন মানুষ সাধুদের সঙ্গে স্নান করে নেয় লুকিয়ে চুকিয়ে অনেকটা যেন অনধিকার চর্চা। কুম্ভপর্বে সাধুদের বিভিন্নভাবে সম্মান, জানানো হয়, যেমন প্রত্যেকবার খাবার সময়, সর্বপ্রথম সাধুদেরকে খাওয়ানো হয়, এবং শাহীস্নানের দিন তাদেরকে বিশেষ ভাবে খাওয়ানো, পোষাক পরিচ্ছদ, কম্বল প্রভৃতি দান করা হয়। এটুকু করেই এইসব প্রতিষ্ঠান এদের দায় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে। এই সমস্ত সাধুরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ছোট ছোট আশ্রমে থাকে। এই আশ্রমগুলি স্বয়ং পরিচালিত, আশ্রম এবং নিজেদের খরচ নিজেদের জোগাড় করে নিতে হয়। এদের মূল সংগঠন অর্থাৎ উদাসীন আখড়া এদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে কোন রকম সাহায্য করে না। দেশের সাধারণ গ্রাম্য মানুষ এখনো পরলোক, ভগবান, সাধু-সন্ন্যাসী

এদেরকে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে গেরুয়াধারী, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে যার সাহায্যে এরা সাধারণ মানুষদের উপকার করতে পারে, এই সাধারণ গ্রাম্য মানুষরা সাধুদের আশ্রম গড়ে দেয়, কখনো কখনো জায়গা, ও জমি দেয় সেখানেই কোথাও ভালোভাবে কিংবা কোথাও কষ্টে সৃষ্টে এরা বাস করে। এই আশ্রমগুলো উদাসীন আখড়ার মূল সংগঠন থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পায়না এবং এদের উপায় আখড়ার কোনও নিয়ন্ত্রন নেই, এরা একরকম স্বাধীন। মূল আখড়া পরিচালিত হয় দেশের ধনী ভক্তদের দানে এবং দানের পরিমান প্রচুর-আখড়ার সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন আশ্রম দেশের বিশেষ করে উত্তর, মধ্য এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে আছে এবং এই গুলোর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আখড়ার হাতে এবং আখড়া এই আশ্রমগুলোকে বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী অর্থ দেয়, এবং বছরের শেষে অডিটের ব্যবস্থাও আছে এবং ঐ আশ্রম গুলোর আয়ের ভাগ আখড়াতে পাঠাতে হয়। আবার অন্য দিকে মূল সংস্থাটি পরিচালিত হয় বহু ধনী ভক্তদের দান এবং সংস্থাটির নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে। ঐ সব ধনী ভক্ত এবং উর্দ্ধতন সাধু মোহান্তদের নিয়ে ট্রাফিক বোর্ড তৈরী হয়, তারা সংস্থাটির পরিচালক। কমবেশি এরকম ভাবেই দেশের অন্যান্য সন্ন্যাসী সংগঠনগুলি পরিচালিত হয়। আসলে বহু প্রাচীনকাল থেকে এই পদ্ধতি চলে আসছে। যতদূর জানা যায় বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে তৈরী সন্ন্যাসী সংঘই ছিল এদেশের প্রথম বৃহৎ আকারের সন্ন্যাসী সংঘ। এর আগে ওই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যেমন জৈন, অজিবীক কিংবা বৈদিক যুগেও কোনও কোন গুরুর নেতৃত্বে ছোট সন্ন্যাসী সংগঠন ছিল হয়ত। কিন্তু বিস্তৃত আকারের সংগঠন বৌদ্ধদের হাত দিয়ে তৈরী হয় এবং সেই সংঘগুলির গঠন প্রণালী এবং পরিচালন পদ্ধতি মোটামুটি বর্তমান কালের মতোই ছিল। প্রধান প্রধান সংঘগুলি রাজা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের দানে পরিচালিত হত এছাড়া বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে থাকত ছোট ছোট বৌদ্ধ মঠ, যেগুলি গ্রামবাসীদের দানে পরিচালিত হত। সেই প্রথা আজও বহমান।

আগামীকাল "শাহীস্নান" অর্থাৎ বিশেষ তিথিতে স্নান। কুম্ভমেলা ১-১$^{১}/_{২}$ মাস ধরে চললেও তার মধ্যে তিন বা চারটি বিশেষ তিথি পড়ে যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী এই তিথিগুলিতে স্নান করলেও অনেক বেশি ফল প্রাপ্তি হয় বলে মনে করা হয়। এই তিথিতে প্রচুর সংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসীদের আগমন ঘটে এবং তারা স্নান করে। ধনী সন্ন্যাসী সংগঠনগুলি শোভাযাত্রা করে স্নানঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। শোভাযাত্রা খুব আড়ম্বরপূর্ণ হয়। একটা সময়ে শোভাযাত্রার মিছিলে অনেক হাতি, ঘোড়া থাকত এখন যানজট এড়ানোর জন্য হাতি, ঘোড়া, উটের সংখ্যাও কমে গেছে, তার বদলে মোটরচালিত রথের ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক সন্ন্যাসী সংঘের আলাদা আলাদা মিছিল হয়। প্রত্যেক মিছিলের পুরোভাগে একটি সুসজ্জিত রথে ঐ সংঘের আরাধ্যা দেবতা বা

প্রতিষ্ঠাতার মূর্তিকে ফুল মালা সহকারে সাজিয়ে রাখা হয়। ঐ রথের পিছনে একটি সুসজ্জিত রথে থাকেন ঐ সংঘের প্রধান, তার পরের রথগুলিতে পরবর্তী পদাধিকারীরা সুসজ্জিত হয়ে চলতে থাকেএবং তার পিছনে পিছনে চলে অসংখ্য সন্ন্যাসী এবং ঐ সংঘের অনুগামী ভক্তরা, যে সংঘের যত বেশী অর্থ বল, প্রতিপত্তি তাদের আড়ম্বর, বিলাসিতা তত বেশি। ঐ শোভাযাত্রাগুলির আগে, মাঝে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যকার, বিভিন্ন ধরনের বাজনা বাজাতে বাজাতে চলে এছাড়া তো রয়েছে ইলেক্ট্রনিক বাদ্যযন্ত্র, মাইক্রোফোন, সাউণ্ডবক্স সে এক অপূর্ব ব্যাপার। এরকম অনেকগুলি শোভাযাত্রা স্নানের ঘাটে এসে পৌঁছায়। এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য বহু মানষ জড়ো হয়। এবং তারা সাধুদের সঙ্গে স্নান করার চেষ্টা করে। এর ফলে স্নানঘাটে এক ভীষণ ভিড়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়, ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়িতে মানুষের জীবন বিপন্ন হবার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমনকি কোনও কোনও সময়ে বহু মানষ পদপিষ্ট হয়ে মারা যাবার ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন ২০০৩ সালে নাসিক কুম্ভমেলাতে রামঘাটে বেশ কিছ মানুষ পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়। স্নানের ঘাট যদি সংকীর্ণ হয় তবে এ ধরণের ঘটনা ঘটার সম্ভবনা আরো বেড়ে যায়। প্রশাসন এই বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন থাকে, এবং ভিড় এড়ানোর বিভিন্ন রকম পদ্ধতি গ্রহন করে থাকে যেমন (১) শাহী স্নানের ২দিন আগে থেকে এবং ১ দিন পর পর্যন্ত শহরের ভিতরে মোটর চালিত যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় । (২) শহরের সমস্ত রাস্তায় শুধুমাত্র মানুষ চলাচলের ব্যবস্থা করে এবং রাস্তা গুলো ওয়ান ওয়ে করে দেয়। (৩) স্নানঘাটে যাবার রাস্তা যতটা সম্ভব দীর্ঘ করা হয়। (৪) রাস্তার দুপাশে শক্ত খুঁটি দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করা হয়। (৫) মাহেন্দ্রক্ষণের কয়েক ঘন্টা আগে এবং কয়েকঘন্টা পর পর্যন্ত স্নানের ঘাটে সাধু, সন্ন্যাসী বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। (৬) সন্ন্যাসী সংঘগুলিকে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া, কোন সংগঠন কখন থেকে কখনের মধ্যে স্নান সেরে নেবে। (৭) ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের স্নানের জন্য অন্য স্নান ঘাটগুলিতে ব্যবস্থা করা হয়।

গত হরিদ্বার কুম্ভে আমি একটি সাধারণ ঘাটে স্নান সেরেছিলাম, তবে এলাহাবাদ কুম্ভে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে স্নান সারতে পেরেছিলাম। এবার কি হবে জানি না শাহী স্নানের আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় প্রশাসন থেকে মাইকিং করা হচ্ছিল, যে পরের দিন ভোর ৪টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত মূল স্নানের ঘাট অর্থাৎ কুশাবর্তে কুণ্ডে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা ভাবছি আমাদের কি হবে? সন্তদাস বাবাজীর কাছে জানা গেল উদাসীন আখড়ার জন্য প্রশাসন সময় নির্দ্ধারণ করেছে বেলা ১০টা থেকে ১১টা। বাবাজী বললেন চিন্তা নেই। সংঘের আইডেনটিটি কার্ড পরে থাকলে ঐ সময়ে সাধুদের সঙ্গে ভক্তদেরও স্নান করতে দেবে। আমরা খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

এ্যম্বকেশ্বরে মূল স্নানের ঘাট হল কুশাবর্ত কুণ্ড। এই কুণ্ড এ্যম্বকেশ্বর মন্দির চত্বরের পিছনের দিকে অবস্থিত। চারি দিক উঁচু পাথরের তৈরী পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে পাথরের দেওয়ালে অপূর্ব কারকার্য্য। ভিতরে আবার গনেশের এবং শিবের মন্দির আছে। কুণ্ডটি চতুষ্কোণ পুকুর, পুরোটি পাথর দিয়ে তৈরী, চারটি ধারে সিঁড়ির ধাপ নীচে নেমে গেছে। দেওয়াল বরাবর মাঝে মাঝে পোশাক বদলের জায়গা আছে। কুণ্ডের চত্বরে ঢোকার দুটি রাস্তা আছে। এই কশাবর্ত কুণ্ডে গোদাবরী স্রোত ঢুকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকে বলে কুশাবর্ত কুণ্ড থেকে গোদাবরী নদী সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাপারটা তা নয় আসলে ব্রহ্মগিরি পর্বত থেকে নির্গত হয়েছে। গোদাবরী নদী এবং এই জলধারাকে পুষ্ট করেছে ঐ পর্বত থেকে নির্গত অনেক ঝরনার জল। নদীটি পাহাড় থেকে নেমে সমতলের ওপর দিয়ে চলার সময় সরু ধারার ওপরে এই কুণ্ডটি তৈরি যার ফলে দেখে মনে হয় নদীটি যেন কুণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

কুণ্ডটি তৈরী করান হোলকার রাজা আপ্পাজী রাওজী পারনেকার। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কুণ্ডটি তৈরী করিয়ে ছিলেন। কুণ্ডটির নাম কুশাবর্ত কুণ্ড। এই নামের পিছনে একটি পৌরাণিক গল্প আছে। এ্যম্বকেশ্বরে ঋষি গৌতমের আশ্রম ছিল। একবার দেশে প্রবল খরা এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অথচ গৌতম মুনির আশ্রমের চারপাশে ভালো বৃষ্টি হতে থাকে। ঋষি গৌতম সকালে ধান লাগাতেন, সন্ধ্যেতে ধান কাটতেন যার ফলে তার আশ্রমে অন্নের প্রাচুর্য্য ছিল। তিনি দেশের বহু ঋষিকে নিজের আশ্রমে রেখে তাদের অন্নকষ্ট থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ঐ সবই ঋষিদের আশীর্বাদ পেয়ে ঋষি গৌতমের পূণ্য ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। পূণ্যের পরিমান যখন অনেক বেড়েই গেল, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য 'বরুন' কে আদেশ বৃষ্টি দেবার জন্য, কিন্তু তাতেও ঋষিরা, গৌতমের আশ্রমেই রয়ে গেলেন। ইন্দ্র নিরুপায় হয়ে পার্বতীর সখী জয়াকে পাঠালেন, জয়া একটি গাভীর মূর্তি ধারন করে গৌতমের ফসল খেতে লাগল, গৌতম গাভীটিকে দূর্বাঘাস দিয়েই আঘাত করলে, গাভীটী মারা যায়। এই ঘটনায় ঋষিরা রেগে গৌতম মুনির আশ্রম ত্যাগ করেন। তখন গৌতম ঋষি এই পাপ থেকে উদ্ধারের উপায় জানতে চাইলে, ঋষিরা বলেন এখানে গঙ্গাকে আবির্ভুত করাতে পারলে গৌতমের পাপ মুক্তি এবং তার জন্য ব্রহ্মগিরি পর্বতে ভগবান শিবের উপাসনা করতে হবে। ঋষি গৌতমের কঠোর সাধনায় শিব সন্তুষ্ট হলেন এবং গঙ্গাকে আবির্ভূত হবার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু গঙ্গা রাজি হলেন না, তখন শিব রেগে তাণ্ডব নৃত্য করতে শুরু করলেন গঙ্গা ভয় পেয়ে ব্রহ্মগিরি পর্বতে আবির্ভূত হলেন এবং ঋষি গৌতমকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলেন। আবার দেখা দিলেন, আবার মিলিয়ে গেলেন। যেখানে যেখানে গঙ্গা আবির্ভূত হচ্ছিলেন সেখানেই একটা করে ঝর্ণা

সৃষ্টি হচ্ছিল। এইভাবে অনেকগুলি ঝর্ণা জলের মিলিত প্রবাহ তৈরী হল। কিন্তু জলের গভীরতা এতটা হল না যাতে ঋষি গৌতম স্নান করতে পারেন। এরপর তিনি ঐ প্রবাহে কুশ ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন যাতে জলটা আটকে যায় এবং তিনি স্নান করতে পারেন। এই ভাবে কুশ দ্বারা আবর্ত কুণ্ড বা কুশাবর্ত কুণ্ড তৈরি হল এবং গৌতম মুনি স্নান করলেন এবং পাপমুক্তি ঘটল। এই সেই পবিত্র কুশাবর্ত কুণ্ড, যেখানে ১২ বছর পর পর কুম্ভমেলাতে স্নানের আয়োজন হয়। প্রশাসন তার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে। এরপর পূণ্যার্থীদের স্নানের পালা।

— ঃ —

A TOUR TO MADHYAPRADESH

-- Ranjan Duley

"What can be better than travelling
as a relaxing break?"

In our daily busy routine we need some break. As a break nothing can be more relaxing as travelling.

As a part of travelting on excurtional tour was preplanned for us by our college. After a long discussion the place of our tour was decided in Madhyapradesh. As our plan we started our journey from our college Sabrakone Govt. P.T. T.I. The main train for our journey was from Asansol, so We have to reach Asansol by the noon. We took a train to reach Asansol from our nearest railway station Piardoba. At right time we reached Asansol and then we had took our Lunch there. After completing our lunch we boarded on our train for Madhya Pradesh. This was the longest train journey for most of us. After boarding on the train we had Crossed three states to reach Madhya Pradesh. The tour was divided in four parts. The first part of our tour was in Khajuraho. we reached the khajurako railway station by delaying almost twelve hours. Our tour was started in the evening of that day. We visited Khajiraho Tribal Museum and then came back to our hotel. As the next day we would travel and see all the temples of Khajuraho We ate our dinner early at night and went to bed. The next day we visited many temples of Khajuraho which were mostly based on lord Bishnu. We had another train journey on that night, so we came back to our hotel and completed our dinner and boarded on the train. The next destination was Ujjain which is mostly know for Mahakel. We were very excited and anxious to see the scenic beauty of Ujjain. We reached Ujjain at dawn. Then we went to our hotel which was approxmatily five hundred metres away from the rail station.

As this was the most beautiful and heart touching part of our tour we prepared us quickly to visit the Mahakaleswar temple of Mahadev, we bought new dresses from theirs and got ready to visit the temple. We went for the temple and the beauty of Mahakaleswar disturbed us with it's beauty. We had entered the temple and watched the temples and the most awaited Mahakaleswar shivling. The night view was more beautiful than the day. So we decided to watch that at night. During the moon we finished our lunch and went to visit another Famous temple Kalbhairav. Affer we visited the Kalbhairav temple on the way back to the Mahakaleswar Temple we entered a Kali temple where we saw a heart touching aarti. After that we went to the Mahakalswar-temple to see the Stunning night beauty of the temple. After Ujjain we went to Bhopal where we visited the Sanchi Stupa and Bhimbetka caves where we found the touch of

our ancesfor and the king Ashoka. We also visited Udaygiri caves and Bhopal Museum there. Affer Bhopal our last destination was Jabbalpur. In Jabbalpur we at first visited to the balancing rock which was very much large and balancing on another rock With a slight touch and after that we visited Madan Mahal Fortfor which we had to Climb two hundhed stairs. After these two places we went to Bhedaghat and Dhuandhar waterfall which relaxed all of our tiredness. The beauty of Bhedaghat was heart touching as we all go through the river by Small boats. The most interesting part was our art teacher started singing when we were sailing in the river. The song of our art teacher filled up us with joy. Our tour ended with Dhuandar Waterfall which's beauty is still stored in my heart. This was about the tour and places. During the whole tour the most interesting thing was the enjoyment of my friends. From starting the tour to the end of the four me and my friends enjoyed a lot. At the last of our academic year if will be stayed in my heart for the whole of my life.

--- : ---

অজানা অনুভূতি

অনন্ত মাজি (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমি কিছুদিন আগে মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। আমার মামাবাড়ি ময়নাপুর নামে একটি গ্রামে। আমি সাধারনত মামাবাড়ি খুব একটা যাই না। যেহেতু দিদা মারা যায় তাই গিয়েছিলাম। আমি মামাবাড়িতে দিদার শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত ছিলাম। তার পরের দিন বিকেলবেলার সময় আমি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি যাওয়ার জন্য। অমি তখন অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত গিয়েছি। হঠাৎ দেখি আকাশে ঘন কালো মেঘ ধরেছে, যখন তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে। হালকা হালকা ঝোড়ো হাওয়া পথের ধুলোগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে নিজের সাথে। বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানি ঘন কালো মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে আর কিছুক্ষণ পর গুরুম গুরুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি যত জোরে সাইকেল চালানো সম্ভব তত জোরে চালাচ্ছি, যে করেই হোক বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই আমাকে বাড়ি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এখনো অনেক রাস্তা বাকি। আমি আর বেশি রাস্তা এগোতে পারলাম না। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর তার সাথে সাথে ঝোড়ো হাওয়া এবং শীল ও পড়ছে। তার একটাই স্বস্তি আমি তখন রাউৎখণ্ডে পৌঁছে গেছি। রাউৎখণ্ড থেকে আমাদের বাড়ি কাছে মাত্র ২০-৩০ মিনিটের রাস্তা। একটা আধভাঙা ভগ্নপ্রায় বাড়ি দেখতে পেয়ে আমি সাইকেল নিয়ে সেইখানে দাঁড়ালাম, যাতে একটানা বৃষ্টিতে ভিজতে না হয়। রাস্তায় লোক নেই, তবে গাড়িগুলো তীব্র বেগে জলের ধারাকে ভেদ করে এগিয়ে চলছে। চারিদিক অন্ধকার, রাস্তার ঘষা ঘষা নিয়ন আলো জ্বলেও, বৃষ্টির দাপটে আরও যেন আবছা হয়ে আসছে আলো। আমি হাত ঘড়িটা উল্টো দেখলাম সাড়ে সাতটা বাজে। বাইরে দেখলে মনে হচ্ছে রাত নটা দশটা হবে। ঝোড়ে হাওয়া এবং বৃষ্টির ছাটে পুরো ভিজে গেছি আমি তাই নিজেকে বৃষ্টির হাত থেকে আরও একটু বাঁচতে এক পা ... এক পা ... করে একটু ভেতরে এগিয়ে যেতে লাগলাম ভগ্ন বাড়ির। হঠাৎ চোখের সমানে একটা কাঠের দরজা দেখতে পেলাম। দরজাটা একটু ঠেলতেই ক্যা...অ্যা...চ..., ক্যা....অ্যা...চ শব্দ করে খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকবো কি ঢুকবো না এই ইতস্তত করতে করতে ঢুকেই পড়লাম। ভিতরের একটা সাইড পুরো ভাঙা, তবে অন্য দিকটা কিছুটা হলেও ঠিক আছে তাই বৃষ্টি সেখানে ঢুকতে পারছে না। ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে আমি ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম, এবং একটা কোণে চুপ করে বসে পড়লাম, আমার শরীর ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে যেতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। আমি হঠাৎ অনুভব করতে পারলাম একটা বাচ্চা মেয়ের হাসার শব্দ ভেসে আসছে, সাথে ছম ছম নূপুরের আওয়াজ। তারসাথে একটা পুরুষ মানুষের গলা এঁই কেঁ তুঁই? চলে যাঁ

এখান থেঁকে। একজন মহিলা হাসতে হাসতে বললো। চঁলে যাঁ এঁখান থেঁকে নাঁ হঁলে তোঁকে মেঁরে ফেঁলবো। আমি তখন ভয়ে কাঁপছি, সবার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি, কিন্তু চোখ খুলতে পারছি না। আমার শরীরে যেন কোনো শক্তি নেই। হাত পা তুলতে পারছি না, কথা বলার চেষ্টা করছি অথচ বলতে পারছি না। চোখ দুটো কে যেন জোর করে বন্ধ করে রেখেছে তাই ফেলতে পারছি না। আমার মাথার মধ্যে একটা চরম ভয় এবং উত্তেজনা কাজ করছে, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে আছি। আমি অনুভব করতে পারলাম এক কম্পনে হঠাৎ চারিদিক কেঁপে উঠল এবং একটা চাপা চিৎকার ভেসে আসতে লাগলো চারপাশ থেকে এবং ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ। আমি নিজের শরীরটাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমার শরীরটাকে অসাড় করে দিয়েছে কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সজাগ আছে তাই সবকিছু অনুভব করতে পারছি। হঠাৎ করে একটা তীব্র আওয়াজে আমার শরীর জেগে উঠলো এবং চোখ মেলে দেখলাম এক কোণে শুয়ে আছি চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার আর আমার মোবাইলটা বেজে চলেছে। মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখলাম মা ফোন করেছে। ফোনটা ধরে বললাম "আমি এক্ষনি আসছি, কাছেই আছি, তুমি চিন্তা করো না"। মা বললো এত হাফাচ্ছিস কেন, সব ঠিক আছে তো, তোর বাবা যাবে নাকি"। আমি বললাম না না তার দরকার নেই, আমি আসছি"। ফোনটা কেটে আমি ফ্লাস লাইট অন করে চারিদিকটা ভালো করে দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম ও বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে ভগবানকে ডেকে তাড়াতাড়ি সাইকেলে চাপলাম এবং একেবারে বাড়িতে এসে থামলাম। বাড়ি পৌঁছে আমি মাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললাম। মা বলল এক বছর আগে ওই বাড়িটাতে একটা পুরুষ তার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে থাকতো। হঠাৎ একদিন রান্নার গ্যাস লিক হয়ে পুরো বাড়িতে আগুন লাগে এবং তারা তিনজনেই আগুনে পুড়ে মারা যায়। তার পর থেকেই ওই বাড়ির কাছ দিয়ে কেউ যায় না। মায়ের কাছে এই কথা শুনে আমি ভগবানকে প্রণাম করলাম সুস্থভাবে বাড়িতে পৌঁছাতে পেরেছি বলে। সেই থেকে আমি ওই বাড়ির কাছ দিয়ে কোনোদিনও যাইনি।

— ঃ —

ভ্রমণ মূলক কাহিনী

শুভজিৎ ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)

ভ্রমণ সব সময়ের জন্য আনন্দের। সেটা যেখানেই হোক। এই পর্যন্ত কয়েকটি জায়গায় ঘুরার সুযোগ হয়েছে। তবে প্রথমের কিছু স্মৃতি মনের ভিতরে আজীবন থেকে যায়। এই রকম একটা স্মৃতি আজ তুলে ধরব। তখন আমি ১১ বছরের বালক। বাবা মার সাথে প্রথম দীঘা ঘুরতে যাওয়া। প্রতি বারের মতো আমি প্রবল খুশি।

প্রথমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে করে রেল স্টেশন এ গিয়ে প্রথম বারের মতো ট্রেনে চাপলাম। এর আগে আমার ট্রেনে চাপার সুযোগ হয়নি। তাই আমি খুব উল্লাসিত ছিলাম। ঝিকঝিক ট্রেন চলছে এই অনুভূতি সেবার প্রথম। সকাল এ ট্রেনের টিকিট কাটা হল। আমি আগেই জানলার পাশের সিট দখল করে বসলাম তারপর একটি বাঁশির শব্দে ট্রেন চলা শুরু হল। আমি তখন টান টান উত্তেজনা নিয়ে বসে আছি ট্রেন চলছে।

তারপর দুপুর এর সময় পৌঁছে গেলাম দীঘাতে। প্রথমে গিয়ে বাবা হোটেল ভাড়া করল এবং আমরা কিছুক্ষন বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের ধারে। প্রথম বার সমুদ্র দেখে আমার আনন্দের যেন শেষ হয়না। প্রথম প্রথম বীচে ঢেউ কাছে আসলে আমি ভয় পেয়ে দুরে সরে আসতাম। আবার যখন স্রোতের টান পড়তো তখন আবার তার পিছু পিছু যেতাম। সমুদ্রে সবাই খেলা করার পর আমরা বীচের মার্কেটে গেলাম কিছু কেনা কাটার জন্য। কেনা কাটার পর আমরা হোটেলে ফিরে এলাম এবং খাওয়া দাওয়া করে রাত্রিটা আমরা হোটেলে কাটালাম। এবং তারপর দিন আমরা ভোর বেলায় ওঠে গেলাম সূর্য দেখার জন্য। সেখানের সূর্যোদয়ের সুন্দর দৃশ্য দেখতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ফিস মার্কেট এর দিকে। সেখানে গিয়ে দেখি চারিদিকে বিভিন্ন প্রকারের মাছ। সেখানে সব সামুদ্রিক মাছ যা আমি কোনো দিন দেখি নাই তাই আমি আশ্চর্য্যের মতো সেদিকেই চেয়ে রইলাম তার জন্য আমরা আবার হোটেলে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। এই ভ্রমণের কথা আমার জীবনে এক সুন্দর স্মরণীয় ঘটনা যা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

— ঃ —

খাজুরাহো ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ

সুমন সোরেন (দ্বিতীয় বর্ষ)

এই ব্যস্ত ভরা জীবনে দিন শেষে চাই একটু মনে শান্তি। মনে পড়ে আমি যখন প্রথম শ্রেণিতে পড়ি তখন বাবা মা এর সঙ্গে দীঘা ঘুরতে গিয়েছিলাম এটাই আমার প্রথম দূরে ভ্রমণ ছিল এবং সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে সমদ্রের ছোটো বড়ো ঢেউ, সেই ছোট বেলার পর তেমন করে কোথাও ঘুরার সময় হয়নি বা হয়ে ওঠেনি। সেই প্রথম শ্রেণি থেকে বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে D.El.Ed এর দ্বিতীয় বর্ষ অনেক দিন পর কোথাও ঘুরার সুযোগ পেয়েছি, এই সুবর্ণ সুযোগ কি হাত ছাড়া করা যায়? তাই ঘুরতে যাওয়ার দিকে একমত তা যেখানেই হোক কিন্তু প্যাকেট ওতো দেখতে হবে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল কাশ্মীর যাওয়া হবে তখন আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের সবার মন আনন্দে দিশাহারা। কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষন রইল না কারন পরে জানতে পারলাম কাশ্মীর যাওয়া বাতিল হল নানা কারনে তাহলে কোথাও যাওয়া হবে না ঠিক হল 'ভারতের হৃদয়' মধ্যপ্রদেশ মনকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল। অবশেষে সেই কাঙ্খিত দিন 4th November আমাদের যাত্রা শুরু হল সাবড়াকোন থেকে দূর ভিন্ন রাজ্য মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে। প্রথমে পিকআপ ভ্যান করে পিয়ারডোবা আর পিয়ারডোবা থেকে লোকাল ট্রেন ধরে আসানসোল জংশন। তারপর এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে খাজুরাহো জনসন যাব, আমার সঙ্গে ছিল সত্যজিৎ, তার প্রথম ট্রেনে উঠা, তাই স্বাভাবিক একটু ভয় করছি। আমার ভয় পাচ্ছিল কিন্তু আসানসোলে সববন্ধু একসাথে এক্সপ্রেস এ উঠতেই ভয় কখন আনন্দে রূপান্তর হল বুঝতেই পারলাম না। 6 তারিখ সকালবেলা বারটা মনে পড়ছে না প্রথম বারের মতো অন্য রাজ্যে পা রাখলাম। অনুভূতিটা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না এতটা আনন্দ ও উৎসাহ হচ্ছিল। স্টেশন থেকে অটো ধরে সবাই হোটেলে গেলাম। হোটেলে গিয়ে দেখি হোটেল দুলছে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে ছিলাম কিন্ত পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি হোটেল দুলছিল না আমি দুলছিলাম এটা ট্রেনে লম্বা যাত্রার ফল। রুমে একটু বিশ্রাম করে ফ্রেস হয়ে পাশের অন্য একটি হোটেলে ভাত খেয়ে আসি তারপর ঘন্টাকয়েক পর সন্ধ্যাবেলা Cultural Village Aadivarat মিউজিয়াম দেখতে যাই। প্রাচীন সব আসবাবপত্র এত গোছালো ভাবে সাজানো আছে তা খুবই সুন্দর আর এই সব প্রাচীন আসবাবপত্রকে আরো সুন্দর করে তুলেছিল আধুনিক সব লাইট যেহেতু আমরা সন্ধ্যাবেলা গিয়েছিলাম তাই সব কিছু ভালোভাবে দেখে উঠতে পারিনি মিউজিয়াম বন্ধ হবে বলে, কিন্তু মনে আপশোস নেই কারন দিনের বেলা গেলে এতসব লাইট দেখতে পেতাম না, ওখান থেকে সোজা ফিরে আসি হোটেলে। রাতে খাবার খেয়ে

ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন সকালবেলা খাজুরাহোর বিখ্যাত রেইফল দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ি ছোটো বড়ো জলপ্রপাত যতনা সুন্দর দেখতে সেখানকার কঠিন বিভিন্ন আকৃতির শিলাগুলি ততটা ভয়ঙ্কর দেখতে শিলার চাড়গুলো। সেখানে কর্মরত কাকুর কাছে অনেক কিছু জানতে পারি যেমন বর্ষাকালে এখানে অনেকগুলি ঝরণা দেখতে পাওয়া যায় যা গণণা করে শেষ করা যায় না এবং আরো অনেক ভয়ংকর রূপধারণ করে এই জলপ্রপাত। এখানে যে শিলাগুলি দেখতে পাওয়া যায় সেইগুলি হল গ্রানাইট, কোয়াটর্জ, ব্যাসল্ট, লামাইট, জেসপার এছাড়াও আমরা ওখানকার নতুন ধরনের গাছ দেখি যা ঋতু অনুযায়ী রং পরিবর্তন করে। গাছের নাম 'কল্লু' রং পরিবর্তনের জন্য এর আর একটি নাম Ghost Tree এই সব দেখে আমরা ফিরে যায় এবং খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়ি খাজুরাহের বিভিন্ন বিখ্যাত বিখ্যাত মন্দিরগুলো দেখতে। মন্দিরগুলো ছিল পুরোটা পাথরের এবং পাথরের উপর খুব সুন্দর কারুকার্য নকশাগুলো নিখুত ভাবে বানানো হয়েছে মন্দির গুলি সব প্রায় একই ধাঁচে তৈরী তাঁর মধ্যে কেমন একটা ভিন্নতা দেখা যায়। আমাদের কলাবিভাগের শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা মহাশয় এই মন্দিরগুলির সম্পর্কে বলছিলেন এর কতটা গুরুত্ব আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে সবথেকে বড়ো মন্দির হল Kandariya Mahadeva Temple এতটা উঁচু ছিল যে Temple এর চুড়া দেখতে পাই নি Temple এর নীচ থেকে সব মন্দির ঘুরে দেখার পর হোটেলে ফিরে যাই কারন রাত্রে আমাদের উজ্জয়নী যাওয়ার ট্রেন আছে। সময় মতো স্টেশনে এসে উজ্জয়নীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, উজ্জয়নীতে আমাদের প্রধান দর্শনীয় স্থান ছিল ভষ্ম আরতির জন্য বিখ্যাত বারো জ্যোর্তিলিঙ্গের এক অন্যতম জ্যোর্তিলিঙ্গ মহাকালেশ্বর জ্যোর্তিলিঙ্গ। যদিও আমাদের ভষ্ম আরতি দেখার সুযোগ হয়ে উঠেনি আরো পাশাপাশি মন্দির দেখতে বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়ি প্রায় সব মন্দির ঘুরার পর কালিমন্দিরের সন্ধ্যাবেলার আরতি দেখে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। আবার সন্ধ্যাবেলা মহাকালেশ্বর মন্দির দেখতে যাই। সন্ধ্যাবেলা মহাকালেশ্বরের মন্দির যেন আরো শতগুন সৌন্দর্য হয়ে উঠে তা কল্পনা করতে পারিনি, কি বাদ দিয়ে কি দেখব তা বুঝে উঠতে পারিনি। ওই দিন ট্রেন ছিল ভোপাল যাওয়ার তাই মহাকালেশ্বর মন্দির থেকে চলে আসতে মন না চায়লেও চলে আসতে হল। ভোপালের নাম এলে প্রথমে মনে পড়ে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর এর গ্যাস দুর্ঘটনা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন মুভি ও বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা গ্যাস দুর্ঘটনাস্থলে যাব না ভোপালে আমাদের ঘুরার স্থান গুলি হল ভীমবেটকা আর ২০০ টাকার নোটে থাকা বিখ্যাত সাঁচীর স্তুপ ও ভোপাল স্টেট মিউজিয়াম। এতদিন যে ইতিহাসের বইএর পাতায় ভীমবেটকা গুহার কথা পড়েছি তা সরাসরি নিজের চোখে না দেখলে তা উপলব্ধি করতে পারতাম না পাথরে আদিম মানুষের নানান চিত্র

তাঁরা তাদের বসবাসের ছাপ রেখে গেছে পাথরের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, আদিম মানুষ তাদের জীবন যাপন ফুটে উঠেছে পাথরগুলোর আঁকা চিত্রের মাধ্যমে। আর এতদিন যে ২০০ টাকার নোটে সাঁচিস্তূপ নিজের চোখে দেখে আসলাম এবং সিড়ির মাধ্যমে উঠেও দেখলাম, আমাদের প্রিন্সিপ্যাল স্যার মনোজকুমার পাণ্ডে মহাশয় সাঁচি স্তূপ সম্পর্কে বলছিলেন। তার পরে একজন গাউড ও নিয়েছিলেন আমাদের স্যার সবার জন্য। আমরা সবাই ভোপাল থেকে মাঝরাত্রিতে ট্রেনে করে বেরিয়ে পড়ি জব্বলপুর দর্শন এর জন্য। জব্বলপুর সত্যিই খুব সুন্দর ও পরিষ্কার। আমরা জব্বলপুরের প্রথমে ভেদাঘাট যাই, যেখানে দুই চোখ ভরে দেখি হিন্দি সিনেমা মহেনঞ্জোদাড়োর সাইট সিন ওখানেই ওই মুভির গানের সিন শ্যাট হয়েছিল ওখানে নৌকায় করে মনোরম সৌন্দর্য উপলব্ধী করি এবং তার সঙ্গে সাঁতরাবাবুর কণ্ঠের গানে যেন আরো মুখরিত হয়ে উঠেছিল আমাদের সাথে ভেদাঘাট। তারপর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে যায় নর্মদা নদীর দ্বারা গঠিত বিখ্যাত ধুয়াধার জলপ্রপাত এতদিন যা ভূগোলের বই এ পড়েছি সামনে থেকে দেখে খুব সুন্দর। যার সৌন্দর্যের কথা বই এর পাতায় প্রকাশ করা যায় না। জলপ্রপাতের সামনে ধোয়ার মতো উড়ে এসে ঠাণ্ডা জলের ছিটে আমার মনকে নাড়িয়ে যাচ্ছিল এ যেন অন্যরকমের মনে শান্তি। জলপ্রপাতের গতির সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলাম মনে মনে ভাবছিলাম এখনি ঝাঁপ দিয়ে দিই ওই জলের গতির সঙ্গে মিশে যায়। মধ্যপ্রদেশে অনেক দেখার মতো খুব সুন্দর সুন্দর স্থান আছে তার মধ্যে আমাদের এই কয়েকটা মাত্র দেখা হয়েছে। অনেক কিছু বাদ হয়ে গেল, মনকে সান্ত্বনা দিয়ে রাত্রিবেলা ট্রেনে উঠি এবার ঘরে আসার পালা। জব্বলপুরকে বিদায় জানিয়ে মধ্যপ্রদেশ ছাড়লাম, তারপর সোজা আসানসোল জংশন। ওখান থেকে স্পেশাল বাসে করে কলেজে ফেরা। কলেজে এসে ট্যুার এখানেই শেষ। ট্যুর এর এই কটা দিন কি করে কেটে গেল তা বুঝতেই পারিনি। এই সব ছোটো বড়ো মুহুর্ত গুলো সব স্মৃতি হয়ে থাকবে চিরদিন।

— ঃ —

শিক্ষামূলক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

অনুপ কুমার সৎপতি

ভ্রমণ সম্পর্কে আমার ধারণা নিছক একটু কম। কারণ আমার ছোটোবেলা থেকে ঘোরাঘুরি সেভাবে হয়ে ওঠেনি। বিদ্যালয় এর গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ এসেই প্রথমবার বাড়ির থেকে বাইরে যাওয়া। প্রথমে একটু ভয় ভয়ই করছিল। কিন্তু স্যারেদের জন্য মনে সাহস পাই। প্রথমে আমাদের ঠিক করা হয় যে আমরা ভ্রমণ এর জন্য কাশ্মীর যাবো। কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রথম সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। তারপর দীর্ঘ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয় ভ্রমণ এর জন্য আমরা 'ভারতের হৃদয়' মধ্যপ্রদেশ যাবো। মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত বিখ্যাত স্থানগুলির মধ্য থেকে আমরা প্রধানত খাজুরাহো, উজ্জয়িনী, ভোপাল, জব্বলপুর এর মতো স্থান গুলিকে বেছে নিই। ভ্রমণ এর জন্য আমরা সবাই সকাল সকাল উঠে বেরিয়ে পড়ি। সকাল ৪টার সময় কলেজ থেকে গাড়ি ছাড়ে সবাই তাতে করে পিয়ারডোবা স্টেশনে উপস্থিত হই অনেক আনন্দ ও একটু ভয় নিয়ে। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে আসানসোল জংশন যাই, কারণ সেখানেই আমাদের মধ্যপ্রদেশ যাবার যাত্রা সঙ্গী। যাত্রা সঙ্গী বলতে ট্রেন এর সিট বুকিং করা হয়েছিল। আসানসোল এ পৌঁছে আমরা সময়মতো ট্রেন ধরি এবং পৌঁছি খাজুরাহো জংশনে। ট্রেনে বন্ধু ও স্যারদের সাথে মজা আনন্দ করতে করতে সময়টা যে কখন পেরিয়ে যায় বোঝাই যায় না। ট্রেন থেকে নেমে আমরা ওখানের বিখ্যাত অটো চালক রকি ভাই এর অটো করে হোটেলে চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়ি Cultural Village Aadivarat মিউজিয়াম দেখতে। হোটেল থেকেও আবার যাবার জন্য সেই বিখ্যাত রকি ভাইয়ের অটোতে বসার জন্য ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে যায় অয়ন মিশ্র ও রঞ্জন দুলের মধ্যে। ওই স্থানের অপরূপ সৌন্দর্য বার বার আমার মনকে নাড়া দেয়। ওই খানে মূলত আমরা পুরনো বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর ঘরবাড়ি রান্নাবান্না করার পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার এক ক্ষুদ্র প্রয়াসকে লক্ষ করি। সময় কম থাকার কারণে অর্থাৎ আমরা যেহেতু রাত্রিবেলা পৌঁছেছিলাম তাই মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় হয়ে যাওয়ায় আমাদের দ্রুত দেখে ফিরে যেতে হয় হোটেলে। পরের দিন সকালে উঠে আমরা খাজুরাহোর বিখ্যাত রেইনফল দেখার জন্য বেরিয়ে যাই। জলপ্রপাত এর সৌন্দর্য ছিল যতটা তেমনই তার উচ্চতা ছিল ততটাই ভয়ংকর। জলপ্রপাত সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি যেমন বর্ষাকালে এখানে যে কতগুলো ঝরণা দেখা যায় তা গণণা করা যায় না। এছাড়াও এটাকে বিখ্যাত জলপ্রপাত নায়াগ্রার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে ৫ ধরনের আলাদা আলাদা শিলা দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলো আমরা পরে সামনে গিয়ে নিজের চোখেই দেখতে পাই। এছাড়াও আমরা গাইড দাদাদের কাছ থেকে একটা নতুন গাছ এর কথা জানতে পারি যে গাছ ঋতুতে রং পরিবর্তন করে। যার নাম হল 'কুল্লু' ইংরেজীতে এই গাছকে Ghost tree ও বলা হয়ে থাকে। জলপ্রপাত দেখে আমরা হোটেল এ চলে আসি এবং আমরা খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়ি খাজুরাহোর

বিভিন্ন বিখ্যাত মন্দির দর্শনের জন্য। পাথরের গায়ে অসামান্য সব সেই কাজ দেখে মন জুড়িয়ে যায়। সময় কম থাকার কারণে এবং অনেকগুলি মন্দির থাকার কারণে আমাদের জলদি করতে হয়। এবং ওইখানের কথা বলতে গিয়ে একটা প্রসঙ্গ তুলে ধরা দরকার আমাদের ওই মন্দিরগুলো সম্পর্কে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার গল্পের ছলে অনেক তথ্য দিয়ে ওই মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সাহায্য করছিলেন। ওই রাত্রি আমরা খাজুরাহোতে কাটিয়ে উজ্জয়নী এর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। আমরা সময়মতো ট্রেন ধরে উজ্জয়নী এ পৌঁছাই পরের দিন ভোরবেলায়। প্রথমে আমরা আমাদের হোটেলে গিয়ে উঠি। কথায় আছে "না ফুটবল রক্তে রয়েছে ওর" তারপর সে যদি হয় আমাদের কলেজের ছাত্র। কোনো প্রতিকূলতা তাকে আটকাতে পারেনি ফুটবল খেলা থেকে বল না পেয়ে বালিশকে বল ও জানলাকে গোলপোস্ট করে হোটেল এর বালিশকে তিনতালার উপর থেকে নীচে ফেলে দেয়। বহু চেষ্টা করেও ওই বালিশকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওই উজ্জয়নের মহাকালেশ্বর মন্দিরের বিখ্যাত ভস্মআরতি যদিও আমরা মিস্ করে যাই। ওই দিন রাত্রিতেই আমাদের ট্রেন ছিল ভোপাল যাওয়ার জন্য তাই ভালোভাবে ওই জায়গাটা ঘোরা হয়ে ওঠেনি। ভোপাল এর বিখ্যাত বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলি ভীমবেটকা, সাঁচি স্তূপ ও ভোপাল এর স্টেট মিউজিয়াম বেছে নেওয়া হয়। এতদিন পর্যন্ত ইতিহাসেই শুনেছিলাম ওই সমস্ত স্থানের সৌন্দর্য্যের কথা। ওই ভীমবেটকার গুহাগুলোর পাথরের ওপর আঁকা আদিম মানুষের চিত্র সত্যিই তৎকালীন রীতিনীতি, সমাজ জীবনধারাকে যেন তুলে ধরেছিল আমার চোখের সামনে। আমাদের মধ্যে থাকা বড়ো বড়ো শিল্পীরা তাদের শিল্পীসুলভ মন নিয়ে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি তাই তারা নেমে পড়েন গাছের পাতা নিয়ে, ওই আদিম মানুষের আঁকা ছবি গুলোর মধ্যে নিজের মত করে কয়েকটা ছবি আঁকতে। এবং এঁকেও ফেলেন বেশ কয়েকটা ছবি। ওই ছবিটা দেখেই হয়তো কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করবেন। এটা কিন্তু বেশ কিছু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নয়। আমরা ভোপাল থেকে সাঁচি স্তূপ ও ভোপাল এর State museum দেখে দ্বিতীয় দিন মাঝরাত্রিতে ট্রেনে করে বেরিয়ে পড়ি জব্বলপুর দর্শন এর জন্য। আমরা জব্বলপুরে প্রথম ভেদাঘাট যাই। সেখানে বার বার আমার দেখা সেই হিন্দি সিনেমা মহেঞ্জোদারোর কথা মনে পড়ছিল। ওখানেই ওই মুভির একটা সিন শুট্ হয়েছিল। এবং আমরা ওখানেই নৌকায় চড়ি। আর ওই ঘোরার সময় আমাদের সবার অনুরোধে সাঁতরা বাবু গান ধরায় সমস্ত পরিবেশটা আরো মুখরিত হয়ে ওঠে। আমরা তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে নর্মদা নদীর প্রবাহপথে গড়ে ওঠা ধুয়াধার জলপ্রপাত দেখতে যাই। ওই জলপ্রপাত এর জল সত্যিই ওখানে ধোঁয়ার সৃষ্টি করছিল যেন। দেখে বোঝা যায় ধোঁয়াধার নামটা যথাযথ বলে। সময়টা যে কীভাবে পেরিয়ে যায় বোঝাই যায় না। খুব খারাপ লাগছিল ট্যুর থেকে ফিরে আসার সময়। ওই জব্বলপুরেই আমাদের ট্যুর সমাপ্ত হয়। এবং জব্বলপুর থেকে আমরা আসানসোল জংশনে ফিরি সেখান থেকে আমরা সবাই বাসে করে কলেজে চলে আসি।

— ঃ —

"মধ্যপ্রদেশ খাজুরাহো"

বরকত মোল্লা (দ্বিতীয় বর্ষ)

ভ্রমণ মানে হল
অচেনাকে চেনা
আর অজানাকে জানা।

তাই এই অজানাকে জানার জন্য আমাদের কলেজ অর্থাৎ সাবড়াকোন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা থেকে একটি ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল, জায়গাটা ছিল মধ্যপ্রদেশ। এই ভ্রমণে আমার কলেজের বন্ধু, শিক্ষক ও তাদের পরিবার ছিল। তাদের সাথে আমরা রওনা দিয়েছিলাম ৪ঠা নভেম্বর ২০২৪ তারিখে মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে। তাই আমরা প্রথমে পিয়ারডোবা স্টেশন থেকে ট্রেনে করে আসানসোল গেলাম। কারন সেখান থেকে আমাদের ট্রেন ছিল সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। তারপর সারারাত ও দিনের প্রায় পুরোটা সময় ট্রেনের মধ্যে ছিলাম। তার পরের দিন অর্থাৎ ৫ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার সময় আমরা পৌঁছালাম মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো জংশন এ। তখন থেকে আমরা সবাই গেলাম একটি হোটেলে। সেই দিন রাতটা আমরা সবাই ওই হোটেলেই ছিলাম। তারপর আমরা সবাই দর্শন করতে বেরিয়ে পড়লাম খাজুরাহোর বিভিন্ন মন্দিরে। সেই মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল চান্দেলা রাজবংশের লোকেরা। শহরের জটিল ভাস্কর্য এবং রাজকীয় মন্দিরগুলি এটিকে দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে একটি করে তোলে। মূর্তি এবং মন্দিরের বিশালতা খাজুরাহোকে মধ্যপ্রদেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্থান করে তোলে। ৯৫০ ও ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পাহাড় কেটে এই খাজুরাহো মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল, ১৯৮২ সালে ১৫ই অক্টোবর মন্দিরটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দেয় ইউনেস্কো। মন্দিরগুলির অধিকাংশ স্থাপনা, মূর্তি ও টেরাকোটা বেল পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। খাজুরাহে অনেক মন্দির ছিল, বাকি ২০টি মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কান্দারিয়া মহাদেব মন্দির। এই মন্দিরটি ১১ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। মন্দিরটি ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এটি একটি ত্রিমাত্রিক কাঠামো এবং এতে একটি দর্শনীয় টাওয়ার আছে। এই মন্দিরটির ভিতরের দিকে ২২৬টি এবং বাইরের দিকে ৬৪৬টি মূর্তি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো আছে। যা আমি আগে কোনোদিন দেখিনি কিন্তু ওই মন্দিরে গিয়ে পরিচালকের মুখে সবকিছু জানতে পারলাম, না গেলে হয়তো এইসব জিনিস আমার অজানা রয়ে যেত। এছাড়াও খাজুরাহে আরেকটি বিখ্যাত মন্দির হল আইকনিক লক্ষ্মণ মন্দির। এই লক্ষ্মণ মন্দিরটি ৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ধঙ্গা এর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি ভগবান

বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা। যদিও এর বিন্যাস কান্দারিয়া মহাদেব এর মতো লক্ষ্মণ মন্দিরের হিন্দু দেবতাদের খোদাই করা দেয়াল এবং অন্যান্য বিস্ময়কর প্রদর্শনী রয়েছে, যা এটিকে বাকী মন্দির গুলির থেকে আলাদা করে তুলেছে। দেবী জগদম্বী খাজুরাহোর সবচেয়ে কামুক মন্দির গুলির মধ্যে একটি। এটি কান্দারিয়া মহাদেব মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত, এই মন্দিরটি ১০০০-২০২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। দেবী জগদম্বী মন্দির পরে দেবী পার্বতী এবং দেবী কালীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। একাত্তরসো মহাদেব মন্দির, যা চৌষঠ যোগিনী মন্দির নামেও পরিচিত, এটি ভারতের প্রাচীনতম খাজুরাহো মন্দির। এখানে দেবী কালিকে উৎসর্গীকৃত করা হয়। এই মন্দিরটি তৈরী করার সময় গ্রানাইটের ব্যবহার করা হয়েছিল। এই বৃত্তাকার মন্দিরে ৬৫টি কক্ষ রয়েছে, তার মধ্যে ছোট যোগিনীদের জন্য এবং একটি দেবী কালীর জন্য। এছাড়া ও খাজুরাহোর আর একটি মন্দির হল দুলাদেও মন্দির। এটিতে শিবকে উৎসর্গীকৃত করা হত। দুলাদেও শব্দের অর্থ হল 'পবিত্র বর'। মন্দিরটি 'কুনওয়ার মঠ' নামে ও পরিচিত। সাতটি রথের পরিকল্পনায় এই মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছিল। এছাড়াও ওই জায়গার মধ্যে আরও অন্যান্য মন্দির ছিল। যেমন বিশ্বনাথ মন্দির, আদিনাথ মন্দির, বামন মন্দির, চর্তুভূজ মন্দির। এই সব বিখ্যাত মন্দিরগুলির দেখার সুযোগ হত না, যদি না আমরা সবাই ওই স্থানে ভ্রমণে যেতাম। ওখানে মন্দিরগুলির কারুকার্য দেখে আমি মনোমুগ্ধকর হয়েছিলাম, যা আগে আমি কোনো দিন দেখিনি, এক একটি মন্দিরের কারুকার্য এতটাই সুন্দর যা দেখে আমার চোখ, প্রাণ ও মন সবই ভরে গিয়েছিল। মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে সেখানের ইতিহাস জানলাম যে মন্দিরগুলি কাদের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল যদি না আমরা সেখানে যেতাম তাহলে আমাদের সবাই ওই স্থানের ইতিহাস অজানাই রয়ে যেত। যা জানার সুযোগ হয়েছিল আমার খাজুরাহো ভ্রমনে গিয়ে।

উপসংহার ঃ মধ্য প্রদেশের রূপ, বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য দৃশ্যাবলী কত সুন্দর তা না গেলে আমরা জানতে পারতাম না। তাই দূরের ভ্রমণ এক আলাদাই মনকে রেখা পাত করে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে কী যে মজা তা ভ্রমণে না গেলে বোঝা যায় না। আর এই বিচিত্র পরিবেশে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ভ্রমণ করলে আমাদের মন অনেক উদার হয়।

— ঃ —

মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

বিকাশ ব্যানার্জী (দ্বিতীয় বর্ষ)

"বিশ্বভুবন মনমোহন বলে কাছে আই'
চার দেওয়ালের গণ্ডি ছেড়ে তাইতো ছুটে যায়"

— সংগৃহীত

ভ্রমণ মানুষের কার না ভালো লাগে ? মানুষ আজীবন ঘুরতে ভালোবাসে। প্রতিটি মানুষের ঘুরতে যাওয়ার একটা নেশা রয়েছে। অনেক অনেক দূরে ঘুরতে যেতে সবারই ভালো লাগে কিন্তু সবসময় তো আর হয়ে ওঠে না দূরে ভ্রমণ করার কিন্তু এই বার যখন সুযোগ এসেছে তা ছেড়ে দিলে তো চলে না। এইবার যখন সুযোগ হয়েছে পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র ছাড়াও কিছু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থান ভ্রমণ করার। মোবাইল বা বইয়ের মধ্যে তো অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থান দেখেছি কিন্তু নিজের চোখে দেখার আগে তো আর কিছু নেই।

"ভ্রমণ মানেই হল
অচেনাকে চেনা আর অজানা কে জানা"

স্থান নির্বাচন - স্থান নির্বাচন একটা ভ্রমণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র তো আছেই তবে এইবার আমাদের সাবড়াকোন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষন সংস্থার সমস্ত অধ্যাপক মিলে আমাদের রাজ্যের বাইরে মধ্যপ্রদেশের কিছু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জায়গা নির্বাচন করেন।

যাত্রা শুরু - সময়টা ছিল হেমন্তের ছোয়ার না খুব গরম না খুব ঠাণ্ডা এক মনোরম প্রকৃতি। ২০২৩ সালের, ০৪ নভেম্বর আমরা সকলেই যাত্রা শুরু করি। প্রথমে আমাদের গন্তব্য ছিল মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহের সমস্ত অংশ। আমরা কলেজ থেকে যাওয়ার জন্য সবাই ০৪ তারিখ সকালে রওনা দিই। আমাদের মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার জন্য ট্রেন ছিল আসানসোল থেকে সন্ধ্যেবেলায়। আমরা তাই আসানসোল যাওয়ার জন্য প্রথমে পিয়ারডোবা থেকে লোকাল ট্রেনে আদ্রা পর্যন্ত যাই। তারপর সেখানে আমরা দুপুরে খাবার খেয়ে আবার সেখান থেকে ট্রেনে করে আসানসোল পর্যন্ত যাই। আমি আসানসোল স্টেশনে কোনোদিন যাইনি। তাই আমাদের কাছে মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার জন্য সময় ছিল তাই আমরা আসানসোল স্টেশন টি ঘুরে নিলাম তারপর রাত্রি ৮টার সময় আমরা ট্রেনে চেপে মধ্যপ্রদেশেদের খাজুরাহের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। ট্রেনের মধ্যে একদিন কেটে যায়। তারপরের দিন বিকেল বেলায় আমরা খাজুরাহোতে পৌঁছায়।

খাজুরাহো ভ্রমণ - আমাদের ভ্রমণটা ০৪ নভেম্বর শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণটা শুরু হয় ০৫

নভেম্বর বিকেল বেলা থেকে। ভ্রমণ করার আগে একটা ঘটনা আমায় অবাক করেছিল। খাজুরাহোতে যেখানে আমরা হোটেলে উঠেছিলাম সেখানে দেখি সব বাংলাতে লেখা আছে এবং আমরা যখন সেখানে খাবার খাই সেখানে দেখি সব আমাদের বাঙালিদের সবার প্রিয় খাবার ভাত, ডাল, আলু ভাজা, পোস্ত খাওয়াছে সেটা দেখে আমার একটু অবাকই লেগেছিল। ০৫ তারিখ বিকেল বেলা আমরা প্রথমে খাজুরাহো শহর থেকে সামান্য দূরে (Aadivart State Museum) যায় এবং সেখানে প্রবেশ করে আমরা সেখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং সন্ধ্যের সেই মুহূর্তটা উপভোগ করি তারপর খাজুরাহো বাজারটা সবাই মিলে একটু ঘুরে দেখলাম এবং হোটেলে চলে গেলাম। পরের দিন সকাল অর্থাৎ ০৬ নভেম্বর আমরা ফ্রেস হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম খাজুরাহো থেকে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার দূরে একটি জলপ্রপাত ছিল সেটি দেখার জন্য। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম জলপ্রপাতটির নাম ছিল 'রেনেহা জলপ্রপাত'। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সে জায়গাটা ভালো ভাবে আমরা দেখলাম আর কিছু স্মৃতি ক্যামেরা বন্দি করলাম যেগুলো আমাদেরকে আজীবন সেই জায়গার কথা মনে করিয়ে দেবে।

তারপর আমরা খাজুরাহো শহরের কিছু ঐতিহাসিক মন্দির পরিদর্শন করলাম —

খাজুরাহো মন্দির - মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের 'ছত্রপুর' জেলার খাজুরাহো শহরের নিকট অবস্থিত প্রাচীন হিন্দু ও জৈন মন্দিরের সমষ্টি ক্ষেত্র। এই মন্দিরগুলো ছিল হিন্দু নাগরিকতার স্থাপত্যের প্রতীক এবং কামোদ্দীপক ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। খাজুরাহো শহরের ৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে ৮৫টি মন্দিরের মধ্যে মাত্র ২২টি মন্দিরে এখনো বিদ্যমান তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

দুলাদেও মন্দির - মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে অবস্থিত শিবকে উৎসর্গকৃত একটি হিন্দু মন্দির । দুলাদেও শব্দের অর্থ হল - 'পবিত্র বর' মন্দিরটি 'কুনওয়ার মঠ' নামে ও পরিচিত। সাতটি রথের পরিকল্পনায় এই মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছে।

লক্ষ্মন মন্দির- খাজুরাহোতে অবস্থিত হিন্দু মন্দির। এটি বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুকে উৎসর্গ করে করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে মন্দিরটি তার স্থাপত্য এবং ধর্মীয় গুরুত্বের জন্য খাজুরাহো স্মারক সমূহের অংশ হিসাবে 'বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান' তালিকাবদ্ধ হয়।

এছাড়াও ওই জায়গার মধ্যে আরও অন্যান্য মন্দির ছিল যেমন - বিশ্বনাথ মন্দির, আদিনাথ মন্দির, বামন মন্দির, চর্তুভূজ মন্দির প্রভৃতি।

উজ্জয়িনী ভ্রমণ - ০৬ নভেম্বর রাতের বেলা আমরা সবাই খাজুরাহো থেকে বেরিয়ে পড়ি এক সুন্দর জায়গা উজ্জয়িনী । ০৬ নভেম্বর পুরো রাত্রি আমরা ট্রেনে যাত্রা করি এবং পরের দিন অর্থাৎ ০৭ নভেম্বর উজ্জয়িনী স্টেশনে নেমে যায়। তখন বাজে সকাল ৬টা। আমরা আমাদের

জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলাম হোটেলে সেখানে ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সবচেয়ে আবেগের যে জায়গা উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর শিব মন্দিরে।

উজ্জয়িনী মহাকালেশ্বর মন্দির - এই মন্দিরটি হল হিন্দু দেবতা শিবের একটি মন্দির এবং বারোটি জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে একটি অন্যতম। এই মন্দিরটি ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের উজ্জয়িনী শহরের রুদ্রসাগর হ্রদের তীরে অবস্থিত। এই মন্দিরটি শিবের সাক্ষাৎ মূর্তি মনে করা হয়। আমরা সকলে ওই মন্দিরটির ভিতরে প্রবেশ করে সেখান থেকে পূজোর সামগ্রী কিনে সেখানে পূজো দিলাম এবং ঠাকুর দর্শন করলাম।

তারপর সেখান থেকে আমরা গাড়িভাড়া করে আশেপাশের বিভিন্ন মন্দির দেখলাম যেমন-'কাল ভৈরব মন্দির' 'মঙ্গলনাথ মন্দির' 'গড় কালিকা মন্দির' ইত্যাদি। সেখান থেকে আমরা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য চলে গেলাম হোটেলে, তারপর রাতের বেলা মহাকালেশ্বর মন্দিরে গিয়ে রাতের দৃশ্য দেখার জন্য। সে কী এক অপূর্ব দৃশ্য ভাবলেই মনে হয় যেন ছুটে চলে যায় আরেকবার সেই জায়গাই।

ভোপাল শহর ভ্রমণ - ০৭ নভেম্বর রাতের বেলা উজ্জয়িনী শহর থেকে ভোপাল যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপে যায়। ০৮ নভেম্বর ভোর বেলায় আমরা ভোপাল শহরে পৌঁছে যায়। সেখানে আমরা হোটেলে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে যায়। ভোপাল শহরে আমরা সেখানে ২দিন থেকে যায়। সেখান থেকে আমরা প্রথম দিন। সাঁচি স্তুপ ও উদয়গিরি পর্বতঘুরি এবং দ্বিতীয় দিন ভীমবেটকা গুহা এবং স্টেট মিউজিয়াম পরিদর্শন করি।

সাঁচি স্তুপ এবং উপয় গিরি ভ্রমণ - ভোপাল থেকে ০৮ নভেম্বর প্রথমে একটি বাঁশে করে সাঁচি স্তুপ যায় এবং সেখান থেকে একজন গাইডকে নিয়ে সাঁচি স্তুপের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম।

সাঁচি স্তুপ - সাঁচির স্তুপ মৌর্য সম্রাট অশোক দ্বারা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে নির্মিত হওয়ায় এটি ভারতের পাথর নির্মিত প্রাচীনতম স্থাপত্য হিসাবে গণ্য করা হয়। অশোকের স্ত্রী দেবী এই স্তূপ নির্মাণের দেখাশোনা করতেন। গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের ওপর অর্ধগোলাকালের এই স্তূপ নির্মিত হয়। এই স্তূপের নিকটে বেলেপাথরের একটি অশোক স্তম্ভ রয়েছে। এই স্তম্ভে ব্রাহ্মী ও শঙ্খ লিপিতে খোদাই করা হয়েছে।

এই স্তূপটি দেখার পর আমরা চলে যায় উদরগিরি পর্বতে সেখানে পর্বতের মধ্যে ছিল অনেকগুলি পাথরের গুহা আমরা সেই গুহাগুলো দেখলাম এবং তারপর আবার ভোপাল শহরে চলে এলাম এবং সেদিন আমরা রাতের বেলা ভোপাল শহরেই থেকে গেলাম।

ভীমবেটকা ও ভোপাল ষ্টেট মিউজিয়াম ঃ- পরের দিন অর্থাৎ ০৯ নভেম্বর আমরা ভোপাল থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে যেখানে ভীমবেটাকার বিভিন্ন প্রস্তর ক্ষেত্র এবং প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রগুলো অবস্থিত।

ভীমবেটকা - মধ্যপ্রদেশের রায় সেন জেলায় ভোপাল শহরের থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ তালে ভীমবেটাকার অবস্থান। এর দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতের একের পর এক শৈল শ্রেণি অবস্থিত। ভীমবেটকার প্রস্তর যুগের একটি গুহা চিত্র। এটাই ভারতের সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতার নিদর্শন। ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের পর্দাপনের প্রথম চিত্র উদ্ধার করা গেছে এখান থেকে। কোনো কোনো গুহায় আজ থেকে আনুমানিক ১ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেক্টাসের বসতি ছিল। ভীমবেটকার প্রাপ্ত কোনো কোনো গুহাচিত্রের বয়স আনুমানিক ৩০,০০০ বছর।

সাঁচি স্তূপ ভ্রমন করার পর আমরা ভোপালের ষ্টেট মিউজিয়াম গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা বিভিন্ন পুরনো দিনের অস্ত্রশস্ত্র দেখেছিলাম এবং আরও অনেককিছু ছিল সেখানে।

জব্বলপুর ভ্রমণ ঃ ০৯ নভেম্বর রাতের বেলা আমরা ভোপাল শহর থেকে যাত্রা শুরু করি জব্বলপুর শহরে। সেখানে আমরা ১০ই নভেম্বর ভোর বেলায় জব্বলপুর শহরে পৌঁছে যায়। সেখানে আমরা হোটেলে উঠি ফ্রেস হয়ে এবং খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি একটা সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র এবং ভৌগোলিক জায়গা মার্বেল রক দেখার জন্য। সেখানে আমরা নর্মদা নদীর মধ্যে নৌকায় চেপে আমরা মার্বেল রকের সৌন্দর্য্য উপভোগ করলাম এবং হিন্দি মুভি 'মহেঞ্জদাড়ো' যেখানে শুটিং হয়েছিল সেখানে গিয়েছিলাম।

মার্বেল রক - মার্বেল রক মধ্যপ্রদেশের জবলপুর গেলার নর্মদা নদী বরাবর একটি এলাকা। নদীটি প্রায় ৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি সুন্দর গর্ত তৈরী করে নরম মার্বেল তৈরী করেছে। এই মার্বেল রকটি নর্মদা নদীর ১০৭৭ কিলোমিটার পাথরের পাশে একটি গর্ত।

এছাড়াও আমরা জব্বলপুরে আরেকটি ভৌগোলিক জায়গা যায় সেটি হল ধুয়ানধার জলপ্রপাত।

ফেরার পালা - ৬ দিন শেষ আবার ফিরে আসা

"সব ঠাঁই মোর ঘরে আছে
আমি সেই ঘর লব খুঁজি"

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্য। নিস্তবধতার মধ্য থেকে তুমি থাকো মধ্যপ্রদেশ। আমরা এই ভ্রমণ পিপাসি মানুষ এখানে খুবই বেমানান আমরা চললাম নিজেদের গন্তব্যে। ১০ নভেম্বর ঠিক রাত্রি ১০টার সময় আমাদের জব্বলপুর থেকে আসানসোল আসার ট্রেন ছিল সেটাতেও আমরা পরের দিন সন্ধ্যে ৭টার সময় আসানসোলে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে বাসে করে আমাদের কলেজে ফিরে আসি।

উপসংহার - মধ্যপ্রদেশের রূপ। বৈচিত্র, ঐতিহ্য দৃশ্যাবলী কত সুন্দর তা না গেলে আমরা জানতে পারতাম না। তাই দূরের ভ্রমণ এক আলাদাই মনকে রেখাপাত করে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে কী যে মজা তা ভ্রমণ না করলে বোঝা যায় না। আর এই বিচিত্র পরিবেশে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ভ্রমণ করলে আমাদের মন অনেক উদার হয়।

— ঃ —

মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

সুমন বাউরি (দ্বিতীয় বর্ষ)

ভূমিকা ঃ- অচেনাকে চেনা বা অজানাকে জানা বা চেষ্টা আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। আমরা সকলেই আত্মীয়স্বজনের মাসির বাড়ি, মামার বাড়ি বা পিসি বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি কিন্তু দূরের কোনো ভ্রমণ আমার কাছে অনেক দিনের আশা আকাঙ্খা তাই আমি চাইছিলাম কোনো দূরের ভ্রমণ যেতে এবং সেখানে গিয়ে অনেক আনন্দ ও সেই জায়গাটিকে উপভোগ করতে।

আর সে আশা এবং ইচ্ছা পূরণও হলো সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষন সংস্থাতে এসে। আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি নীচে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করা হলো -

স্থান নির্বাচন ঃ- যথাযথ স্থান নির্বাচন একটি সুন্দর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাহাড়, নদী, মন্দির ও নানা দর্শনীয় স্থান আমার অত্যন্ত পছন্দের বিষয়। সাবড়াকোন সরকারী শিক্ষক শিক্ষন সংস্থাতে এসে শুনলাম, এখানে প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Educational Tour) এ নিয়ে যাওয়া হয়। এবার আমাদের এই শিক্ষক শিক্ষন সংস্থা ভ্রমণের স্থান হিসেবে 'মধ্যপ্রদেশ' জায়গাটিকে বেছে নিয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের বিবরণ ঃ-

মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা - (৪ই নভেম্বর, ২০২৩) তারিখে আমি আমার কলেজের সমস্ত ক্লাসমেট ও স্যারদের সাথে মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের কলেজ থেকে আমাদেরকে পিকাপ ভেন এ করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় পিয়ারডোবা জংশনে, সেখানে পৌঁছে দেখি ট্রেন আসতে তখনও ১ ঘন্টা দেরি। তাই পিয়ারডোবা স্টেশনে আমি কিছু ফটো ও ভিডিও শ্যুট করি ও সব বন্ধুরা মিলে একটু মজা করি। ট্রেন আসতেই আমরা ট্রেন এ উঠে পড়ি এবং রান্নার জন্য কিছু সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছিল তা সবকিছু ট্রেনে তুলে দিয়ে সীটে বসে পড়ি। এই ট্রেনটির নাম ছিল হাতিয়া এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটিতে করে আমরা পিয়ারডোবা রেল স্টেশন থেকে আদ্রা জংশনে পৌঁছায়। সেখানে গিয়েও দেখি ট্রেন আসতে দেরি আছে। তাই আমরা আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র প্লাটফর্মের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে খাবার খেতে যায়। সেই মুহূর্তে গরমে আর অস্বস্তিতে আমার তেমন কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল না, তাই আদ্রা জংশনের বাজার থেকে দুটো কলা কিনে খেলাম তারপর প্লাটফর্মে এসে যে যার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে ট্রেন এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। যখন ট্রেন আদ্রা জংশনে পৌঁছায় তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। তারপর আমরা সেই ট্রেনে উঠে পড়ি সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছায় আসানসোল জংশন। আমি আগে অনেক

আত্মীয় এর কাছে শুনেছি এবং খবরের কাগজেও পড়েছি এই আসানসোল জায়গাটি কেন সুবিধার নয়, তাই আমি সাবধানতার চোখ নিয়ে চারিদিকে বার বার দেখছিলাম। একটা অচেনা ভয় ও একটা অচেনা আনন্দ বার বার আমার মনকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারপর মনটাকে শান্ত করার জন্য আসানসোল প্লাটফর্টের চা এর দোকান থেকে এক কাপ গরম চা কিনে খেলাম। তারপর আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসতেই আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি তারপর যে যার সীটে বসে পড়ি, যেহেতু এই ট্রেনটি আমাদের রিজার্ভ করা সীট ছিল, তাই আমাদেরকে তেমন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। তারপর আমরা আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে করে (৫ই নভেম্বর ২০২৩) তারিখে বিকেল ৪টার পরে খাজুরাহো জংশনএ পৌঁছায়। সেখান থেকে টোটোতে করে আমাদের বুকিং করা (oyo Hotel) দাদা বৌদির হোটেলে যাই। সেখানে পৌঁছে প্রথমে ফ্রেস (হাত-মুখ ধুয়ে) খাবার খেতে যাই। তারপর হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা 'আদিবর্ত মিউজিয়াম' দেখতে বেরিয়ে পড়ি। সেখানে গিয়ে সবাই নিজের নিজের টাকায় টিকিট কেটে মিউজিয়ামে নানা জিনিস দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু মিউজিয়ামের ভিতর কোনো ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না বলে তেমন কোনো ছবি তুলতে পারিনি। তবে কিছু ছবি তোলা হয়েছে যেগুলো অমূল্য এরপর আমরা মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকা নির্জন স্থানে যাই ফটো তুলার জন্য। সেখানে ফটো তোলা হয়ে গেলে আমরা আবার হোটেল দাদা বৌদির oyo ফিরে আসি। সেই রাতটা ওই হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন সকালে অর্থাৎ (৬ই নভেম্বর, ২০২৩) আমরা খাবার খেয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ি 'Ranch Water fall' দেখার জন্য, টোটোতে করে পথে যাওয়ার সময় অনেক ধরনের জীবজন্তু দেখতে পায় কিন্তু 'Ranch Water fall' এ গিয়ে পৌঁছায় সেখানাকার পুরোনো অগ্ন্যুপাতের ফলে সৃষ্ট খাদ দেখে এবং ব্যাসল্ট, গ্রানাইট, মার্বেল এই তিন ধরনের গঠিত শিলা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেছিলাম। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্যার আমাদেরকে এই তিন ধরনের পাথর সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেন এবং ওনার বলা মূল্যবান কথাগুলোর মাধ্যমে আমরা এই খাদ ও পাথরগুলো নিয়ে অনেক কথা জানতে পারি। 'Ranch Water fall' থেকে বেরিয়ে আমরা টোটো করে অনেক অনেক বছরের পুরোনো মন্দির দর্শন করতে যাই তার মধ্যে যে মন্দিরগুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেগুলি হল - বামন মন্দির, চর্তুভুজ মন্দির, জবারী মন্দির, পরেশ মন্দির, আদিনাথ মন্দির, দুয়োদৈয়ো মন্দির ইত্যাদি।

মন্দির দর্শনের পর সেখান থেকে আমরা যাই 'World Heritage' দর্শনে যেখানে ছিল শত শত বছরের পুরোনো চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, জগদম্বী মন্দির ও কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির এই মন্দিরগুলোর ডিজাইন ও আকৃতি অনেক রকমের ছিল এবং সব কিছুই পাথরের তৈরি, যা আমার

মনকে খুব আকর্ষিত করেছিল। আরও অন্যান্য মন্দির ছিল যেমন মাতঙ্গ সভরা মন্দির, বরাহ মন্দির, প্রতাপেশ্বর মন্দির, নদী মন্দির, চিত্রগুপ্ত মন্দির ইত্যাদি। সেখানে ছবি তুলে সবাই খুব আনন্দে মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছিলাম। তারপর হোটেলে এসে যে যার মতো সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে খাজুরাহো থেকে উজ্জয়িনী যাওয়ার জন্য খাজুরাহো জংশনে এসে পৌঁছালাম। সেখান থেকে ট্রেনে করে উজ্জয়িনী পৌঁছোলাম। যেহেতু খাবার হোটেল থেকে তৈরী করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাই খাওয়ার কোনো একটা অসুবিধা হয়নি। ট্রেনে যাওয়ার সময় টিফিনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। উজ্জয়িনীতে এসে আমাদের বুকিং করা হোটেল (আদর্শ) তে বিশ্রাম নিয়ে স্নান করে সেখানকার বিখ্যাত শিব মন্দির (মহাকালেশ্বর মন্দির) দর্শন করার জন্য বেরিয়ে পড়ি। সেখানে গিয়ে আমি পূজো দিয়েছিলাম। তারপর কালভৈরব মন্দির দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়ি। সেখানে আরো অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে গিয়েছিলাম কিন্তু তার মধ্যে সন্দিপনি মুনীর আশ্রম আমাকে আকর্ষন করেছিল। আরও নানা রকম দেব দেবীর মূর্তি দেখে অনেক আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। এরপর আমরা হোটেলে (আদর্শ) ফিরে এসে নিজের নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে উজ্জয়িনী জংশন-এ এসে সেখানে উজ্জয়িনী থেকে ভূপাল থেকে ট্রেনে করে পৌঁছালাম ভূপাল জংশনে। তারপর সেখান থেকে গেলাম আমাদের বুকিং করা হোটেলে (CFC হোটেল)। হোটেলে পৌঁছে খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রমী লাগছিল তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম, নেওয়ার পর স্নান সেরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা ভীমবেটকা গুহাচিত্রে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ি। ভীমবেটকা যাওয়ার জন্য আমাদের প্রধান পরিচালক অধ্যাপক শ্রী পল্লব ঘোষ মহাশয় একটি বাস ভাড়া করেন। বাসে করে ভীমবেটকা পৌঁছে সেখানে আদিম মানুষের আঁকা নানা জীবজন্তু বৃক্ষ এছাড়াও অন্যান্য ছবি দেখলাম। এছাড়াও বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই আদিম মানুষের থাকার জায়গা ইত্যাদি দেখে অনেক আনন্দ হই। বিশেষ করে আনন্দিত হয়েছিলাম এই জন্য যে এতদিন পর্যন্ত আমি যা কিছু পাঠ্যপুস্তক পড়ে এসেছি তা সবকিছুই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ভীমবেটকা পরিদর্শন হয়ে গেলে এরপর আমরা বাসে করে উদয়গিরি পাহাড়। সেখানে টিকিট কেটে পাহাড়ে উঠে পড়ি। পাহাড়ের উপর থেকে নীচের এলাকা যে কতটা সুন্দর মনোরম হয় সেটা পাহাড়ের উপর উঠার পর পাহাড়ের নীচের এলাকায় অবস্থিত গ্রাম দেখে বুঝতে পারলাম। সেখানে প্রাকৃতিক কিছু ছবি তুলে আমরা পাহাড় পরিদর্শন করতে থাকি। পাহাড় দেখা হয়ে গেলে আমরা আমাদের ভাড়া করা বাসে করে যায় 'স্টেট মিউজিয়াম ভূপাল' সেখানে ও টিকিট কেটে মিউজিয়ামে ঢুকি সেখানে দেখি অনেক পুরোনো পাথরের তৈরি নানা দেবদেবীর মূর্তি। এছাড়া ও আগের কালের আদিম মানুষের অস্ত্রশস্ত্র, রাজাদের পোশাক, মুকুট, তরবারি এছাড়া ও বহু অমূল্য বাণী খোদাই করা বিভিন্ন সেট এ। আগেকার যুগের বাসন পত্র, বস্ত্র ইত্যাদি ও সেখানে সংগৃহীত করে রাখা হয়েছিল। তারপর আমরা মিউজিয়াম

দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে দোকান থেকে কিছু কিনে খাই। তারপর বাসে করে আমাদের হোটেল (CFC) তে এসে পৌঁছায়। সেখানে রাত্রির খাবার খাওয়া দাওয়া আমরা বিশ্রাম নিই পরের দিন সকালে খাবার খাওয়া দাওয়া করে ভাড়া করা বাসে করে সাঁচির স্তূপ দেখতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ি। অন্য একটি রিজার্ভ করা বাস আমাদের সাঁচী স্তূপ এ নিয়ে গিয়ে পৌঁছায়। আমাদের ২০০ টাকার নোটের পিছনে যে স্তূপের ছবি আছে, এটা হলো সেই সাঁচীর স্তূপ। সেখানে আমরা গাইড নির্বাচন করে সাঁচীর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি এছাড়াও সাঁচীর আশেপাশের দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করি তারপর হোটেলে এসে বিশ্রাম করার পর ঠিক সন্ধ্যার সময় জব্বলপুর যাওয়ার জন্য ভূপাল জংশনে এসে উপস্থিত হলাম।

ভূপাল থেকে জব্বলপুর ঃ- ভূপাল জংশন থেকে ট্রেনে করে জব্বলপুর জংশনে পৌঁছালাম। সেখান থেকে টোটোতে করে আমরা হোটেল (শ্যাম) তে পৌঁছালাম সেখানে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আমরা দেখতে যাই ব্যালেন্সি রক ও মদন মহল দুর্গ, সারদা দেবীর মন্দির ইত্যাদি। এইসব স্থান পরিদর্শন করা হয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের ভাড়া করা বাসে করে যাই নর্মদা নদীর ওপর অবস্থিত ধুয়ানধার জলপ্রপাত দেখতে। সেখানে আমরা সবাই নৌকায় চেপে নর্মদা নদী ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করছিলাম। আমাদের কলেজের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা মহাশয় একটি গান ধরেছিলেন এবং আমরা সবাই ওনার সাথে তাল মেলাচ্ছিলাম। গানটি ছিল -

দে দে পাল তুলে দে
মাঝি হেলা করিস না
ছেড়ে দে নৌকা আমি
যাব মদিনা।

সত্যি বলতে গেলে খুব আনন্দেই নর্মদা নদী পাড়ি দেওয়ার সময়টা উপভোগ করেছি। তারপর সেখানে মার্বেল পাথরের তৈরি কিছু জিনিসপত্র কিনে আমরা যায় ধুয়ানধার জলপ্রপাত দেখতে। সেখানে গিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া। সেই দৃশ্য এতটাই আশ্চর্য ছিল যে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। নদীর অনেক উঁচুতে রোপওয়ে ছিল যেটা প্রথমবার নিজের চোখের সামনে অর্থাৎ বাস্তবভাবে দেখতে গেলাম। ধুয়ানধার জলপ্রপাত পরিদর্শন হয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে আসি। তারপর সবকিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমাদের কলেজ ফিরে আসার উদ্দেশ্যে জব্বলপুর জংশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ট্রেন আসার পর ট্রেনে উঠে পড়ি নিজেদের রিজার্ভ করা সীটে গিয়ে বসে পড়ি। তারপর আমরা (১১ নভেম্বর, ২০২৩) তারিখে আসানসোল জংশনে এসে পৌঁছায় ঠিক রাত ৮.৩০ এর সময়। তারপর সেখানে খাওয়া দাওয়া করে ওইখানের একটা রিজার্ভ করা বাসে করে আমাদের কলেজে এসে

পৌঁছায় (১২ই নভেম্বর, ২০২৩) তারিখে।

আমার অনুভূতি ঃ সত্যি করতে এমন এত রোমাঞ্চকর হয় সেটা জানতাম না, সেটা ভ্রমনের সময় জানতে পেরেছিলাম। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল ও তার সাথে আমার চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। এইভাবে প্রকৃতির কোলে কয়েকটি দিন কাটিয়ে আমরা নিজেদের জীবনে ফিরে আসলাম। সত্যি । আমার এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ খুব রোমাঞ্চকর ও আনন্দপূর্ণ ছিল।

উপসংহার ঃ- সর্বশেষে আমি এটাই বলব যে যদি কেউ কোনো দিন ভ্রমনের সুযোগ পাও, হাতছাড়া করো না। ভ্রমণের ফলে যে আমাদের কেমন feel হয় সেটা যে ভ্রমণ করে একমাত্র বুঝতে পারে। আমার এই ছোট্ট খাতাতে নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। আসলে প্রাকৃতিক জিনিস বা দৃশ্য যে কতটা সুন্দর হয় তা ব্যাখ্যা করার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা চিরতরে গেঁথে থেকে যাবে মনের এক কোনে। বারবার মনে হয় যদি আরও পারতাম ওই ভ্রমনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে, তাহলে হয়তো আরও প্রকৃতির কোলে কিছুটা সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু সেটা ভাবতে গেলেও বুকটা একটা অন্যরকম করে ওঠে ... অবশেষে স্মৃতি হয়ে থেকে যাই ক্যামেরা বন্দি কিছু ছবি।

— ঃ —

কুয়াশার চাদরে মোড়া নির্জন রাস্তা

প্রত্যুষ গুঁই (প্রথম বর্ষ)

উফ! নীলদিগন্তপুর যাওয়ার শেষ লোকাল ট্রেনটাতে উঠে হাফ ছাড়লাম এতক্ষণে। এত প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও যে একটা সিট পাবো তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি অনিকেত সেনগুপ্ত। আজ আমি চলেছি আমার দিদির বাড়ি গুঞ্জনপুরে। জানালার ধারের সিটটাতে বসে কৃষ্ণপুর স্টেশনের মানুষের ব্যস্ততা আমার কল্পনাপ্রবণ ক্লান্ত দুটি চোখ নীরব দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরই ট্রেন ছেড়ে দিল। দুই-তিনটি স্টেশনের পর ট্রেন যখন বশিরহাট স্টেশনে পৌঁছালো তখন ট্রেন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। দেখলাম এক বৃদ্ধ মানুষ এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে শাল গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডাতে কাঁপতে কাঁপতে আমার পাশে এসে বসল। এখন বাজে রাত ন'টা। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ট্রেন হাজার হাজার মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলেছে। ট্রেনের জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে চারপাশের শূন্যতা। মেন হয় ট্রেন নীলদিগন্তপুর স্টেশনে পৌঁছাবে রাত দশটা নাগাদ। কানে হেডফোনটা গুঁজে তাই গান শুনতে আরম্ভ করে দিলাম। মৃদুমন্দ কাঁপুনি বাতাসে আর ট্রেনের দোলনে এই শীতের রাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা বুঝতে পারিনি। চোখ খুলতেই দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ। হাতে থাকা ঘড়ির সময়টা দেখে চমকে উঠলাম। তখন ঘড়িতে বাজে রাত এগারোটা। পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ মানুষটি আর নেই বসে। তাই সামনে থাকা মাঝবয়সী একটি মহিলাকে কারন জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন - ট্রেনের ইঞ্জিনে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে তাই ট্রেন প্রায় এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে। একথা শুনে 'ধুর বাবা' বলতে যাবো কি ট্রেনের হর্ণ শোনা গেল। যাক ট্রেনটা ছাড়ল। তারপর মিনিট কুড়ি পরই ট্রেন এসে দাঁড়াল নীলদিগন্তপুর স্টেশনে। ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়লাম স্টেশনে। স্টেশনে একটাও মানুষ নেই। চারিদিক ফাঁকা ও কুয়াশায় ঢাকা। এরপরই হাতের মুঠো ফোনটা বেজে উঠলো। দিদির ফোন। ফোনটা তুলে হেঁটে চললাম। দিদি বললো - কী রে কতো দেরি হবে? জানি না রে ট্রেন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর দিদি বললো - আর শোন নীলদিগন্তপুরের জঙ্গল পেরোনোর সময় কোনো অটো বা টোটো ধরবি ....। ব্যাস! ফোনটা কেটে গেল। গ্রামে এ এক বড় সমস্যা সিগনালের সমস্যা। তবে দিদি কী যে বলতে যাচ্ছিল কে জানে - কী যেন বলছিল অটো বা টোটো ধরবি না ...। কে জানে কী বলছিল। মনে হয় না এত রাতে কোনো যাবনবাহন পাবো। শেষ বাস ছিল দশটা কুড়িতে তাও চলে গিয়েছে। স্টেশন থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কুয়াশাতে ঢাকা শীতের রাতে রাস্তাতে আমি ছাড়া কেউ নেই। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর দূরে কুয়াশা ভেদ করে একটা আলো দেখা গেল। সামনে আসতে দেখি সেটি একটি টোটো। টোটোর লোকটি জিজ্ঞাসা করলো -

চাপবেন নাকি? আমি চেপে পড়লাম ও টোটো গুঞ্জনপুরে যাওয়ার রাস্তায় রওনা দিল। লোকটাকে প্রশ্ন করলাম - তা আপনি এত রাতে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতে এ নির্জন রাস্তায় হঠাৎ? লোকটা একরাশি বিদঘুটে হাসি নিয়ে কর্কশ স্বরে বলে উঠলো - এ আমার রোজের রুটিন। লোকটার এমন সব আজব উত্তর শুনে আর কথা বলতে ইচ্ছে করলো না। যাক বাবা এত রাতে একটা টেটো পেয়েছি এই অনেক। এদিকে ফোনে চার্জ নেই যে দিদিকে ফোন করে বলে দেবো তাই দিদিকে মোবাইলে একটা টেক্স মেসেজ করে জানিয়ে দিলাম। এই যা ! মোবাইল সুইচ অফ ! ব্যাস ! এরপর এক রাশ ক্লান্ততা আর ফুরফুরে হাওয়া, টোটোর সো সো শব্দ যেনো আমার চোখের পাতা বন্ধ করতে বাধ্য করলো। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলেই দেখি টোটো দাঁড়িয়ে। এই যা টোটোর লোকটা কোথায় গেল? আমার এই এক সমস্যা গাড়িতে বসেছি না ঘুম যেন দুয়ারে দাঁড়িয়ে। উফ! এখন এই জনমানবশূন্য পথে লোকটাকে কোথায় খুঁজবো? হঠাৎ একটু দূরে দেখতে পেলাম একটি টিনের চালুনি দেওয়া ঘরে একটি হলুদ টিমটিমে আলো জ্বলছে। কৌতুহল বশত এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমার দুই চোখ প্রস্তুত ছিল না। সেই লোকটা ... হ্যাঁ হ্যাঁ সেই টোটোর লোকটা .... না লোক না পিশাচ। সে এখন এক পৈশাচিক রূপ নিয়েছে। তার দুই চোখ অক্ষিকোটরে ঢুকে গেছে, তার দেহ রক্তহীন, দাঁত নেই, তার মুখের একদিক দিয়ে ঝরে পড়ছে তাজা লাল রক্ত। সেই লোকটার সাথে আরও কয়েকটা পৈশাচিক মূর্তি। তারা পরস্পরের মধ্যে কোনো বিষয়ে তর্ক করছে। টোটোর সেই পিশাচ মূর্তি লোকটা বলল - নে নে তাড়াতাড়ি কর আরও একটা মানুষ তো অপেক্ষা করছে। ওরা যে আমাকেই বলছে তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। আমার হাত-পা-ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমি দেখলাম ওরা একটা দেহকে কী নৃশংসভাবে কাটছে। এসব দেখে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম আর সেখান থেকে দৌড় দিলাম। ওই পিশাচ রক্তমাংসহীন দেহগুলো আমার পিছনে আসছে। আমি শুধু ছুটে চলেছি। জানি না কোথায় যাব। জানি না শুধু চোখ বুজে ছুটে চলা .... ছুটে চলা ... আর ছুটে চলা।

চোখ খুলতেই দেখি আমি দিদির বাড়ির বিছানায় শুয়ে। দিদি বললো - আমি তোর ওই টেক্স মেসেজ দেখে বিপদ আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তাই তোকে ফোনে না পেয়ে আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তারপরই তোকে রাস্তার ধারে একটা গাছের নীচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। আসলে ওই রাস্তায় রাত্রিবেলায় টোটো বা অটোতে চাপা মানেই বিপদ। দিদি আরও কিছু বলুক আমি থামিয়ে দিলাম কারণ সবই আমার দ্রষ্টব্য।

দুপুরে খাওয়ার পর মৃদু মন্দ রোদে একটা চাদর গায়ে দিয়ে দিদির বাড়ির ছাদে বসেছিলাম। কাল রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমাকে প্রতি মুহূর্তে এক অদ্ভুত শিহরণ দিচ্ছে।

পরদিন সকালে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ট্যাক্সিতে জঙ্গলটা দিয়ে স্টেশন যাওয়ার পথে আরও একবার সেইদিন রাতের কথাটা মনে পড়ে গেল। রাস্তায় সেই জায়গায় আর সেই বাড়িটা নেই। সেই বাড়িটা হয়তো প্রতি রাতে একবার করে জেগে উঠবে। উদিত সূর্যের হালকা রশ্মিতে কাঁপানো ঠাণ্ডায় কুয়াশার মধ্যে সেই রাতের ভয়ঙ্কর জঙ্গলই যেন অপূর্ব প্রকৃতির রূপে সেজে উঠেছে। রাতের জঙ্গলের ভয়ঙ্কর রূপ আর এখনের অপরূপ সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করে একটাই উক্তি বলতে বাধ্য করলো - "প্রকৃতি আমাকে হাসায়, প্রকৃতি আমাকে কাঁদায়!/ প্রকৃতি আমাকে ভাঙ্গে গড়ে, প্রকৃতি আমাকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়।"

ট্যাক্সির ড্রাইভার হঠাৎ বলে উঠলো - "বাবু স্টেশন এসে গেছি।"

— ঃ —

শিক্ষিত সমাজের অশিক্ষিত রূপ আচরণ

অনুপ কুমার সৎপতি

"শিক্ষা আনে সভ্যতা
সভ্যতা আনে মানবিকতা।"

- চারিদিকে শুধু এটা নিয়েই চর্চা রয়েছে। বিভিন্ন ইন্টারনেট মাধ্যমগুলোতে ভাইরাল এই বাক্যটি। যদিও আমার ধারণা খুবই কম এসব ব্যাপারে। কিন্তু যে দেশে মোট জনগণের মধ্যে ৭৪.০৪ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর (২০১১ সালের জনগণণা অনুসারে) সেখানে এইসব ব্যাপার চর্চার মাঝখানে থাকা বেশ কিছু আশ্চর্য্যজনক নয়। তবে এত ভারী ভারী কথা স্বাক্ষর। জনগনণা, ইন্টারনেট এর মাঝে যে আসল আসল কাজটা করতে এসেছিলাম সেটাই ভুলে গেলাম। কাজ বলতে তেমন কিছুই না প্রত্যহ দিনের মতো আজও একটা শোনাব বলে গল্পের ঝুড়ি থেকে পড়ে এসেছিলাম একটা গল্প। কিন্তু প্রত্যেক দিনের মতো গল্পটা কোনো রাজপুত্তুর বা দৈত্যি, দানব বা পক্ষীরাজকে নিয়ে নয় আজকের গল্পটা একটু অন্যরকম, মানে অন্যরকম বলতে একটা শিশুর গল্প তাকে নিয়ে ঘটে যাওয়া। একটা অদ্ভুত ঘটনা সেটাই আর কী। শিশুটির একটা রোগ হয়েছে ডাক্তারি ভাষায় রোগটার নাম হল 'ওথেলো সিনড্রোম'। গল্পটা শোনার আগে আমরা রোগটা সম্পর্কে কিছু কথা শুনি তাহলে গল্পটা শুনতে ও বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে। এটি একপ্রকার মানসিক রোগ; এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মনে সন্দেহ ও ভয় কাজ করে। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেশি তাই আমরা এই রোগীদের বিভিন্ন নামে ডেকে থাকি তাদের , কেউ কেউ টাল বলে থাকি। কেউ বা ভালোবেসে 'ক্ষ্যাপা', কেউ বা আবার তারকাঁটা বলে থাকি। এত কিছু শোনার পর সবার মোটামুটি রোগটা সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মেছে। তবে এরপর শুনুন বাকি গল্পটা। যে ছেলেটাকে নিয়ে আমরা কথা বলব তার নাম খোকন। ওই খোকনের এই রোগ হয়েছে। এই রোগের প্রকোপ বাড়লেই খোকন নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য জায়গা খোঁজে এবং যেখানে সে নিরাপদ বোধ করে সেখানে আশ্রয় নেয়। একদিন রাত্রিতে এই 'ওথেলো সিনড্রোম' নামক রোগের প্রকোপ বাড়ায় সে নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয় এবং সে আর বাড়ি যাবে না, বাড়ি যাবে না বলে জেদ করতে থাকে। মা গিয়ে খোকনের বাবাকে খোকনের এই জেদের কথা বললে বাবা রেগে বোম হয়ে যান। এবং আমাদের বাড়িতে এসে খোকনকে মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে যান। থামুন থামুন বিরক্ত হয়ে পুরো গল্পটা না শুনে চলে যাবেন না। ভাবছেন তো কী নিষ্ঠুর বাবা খোকনকে কীভাবে মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে গেল। এখানে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। এখানে খোকন দিনে দিনে বড়ো হয়ে বাবার জায়গা

নিয়েছে। আর খোকনের জায়গা নিয়েছে তার বাবা। আর সবথেকে বড়ো আশ্চর্যজনক ব্যাপার খোকন যখন তার বৃদ্ধা বাবাকে মারছে তা দেখে ওইখানে উপস্থিত থাকা কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না। বরং তারা কেউ বলছে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আবার কেউ বলছে কত সহ্য করবে। আবার ওনাদের মধ্যে কেউ আলোচনা করছেন 'আমরা কি বাড়িতে ছেলেদের মারি না?' কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে বলি আমরা হয়তো বাড়িতে ছেলেদের মারি ঠিকই তাকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য তাকে ওইরূপ অমানুষ এর মতো আচরণ করার জন্য নয়। শিক্ষার চুড়ান্ত বা সর্বোত্তম লক্ষই হল ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। এটাই কী ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ? এটাই কী আমাদের শিক্ষিত সমাজের কাঙ্খিত আচরণ। সত্যিই কি আমরা শিক্ষিত?

আমি আবার কল্পনাপ্রবণ মানুষ এই কাহিনী পড়লেই নচিকেতার সেই গান বারবার নাড়া দিয়ে ওঠে আমার কল্পনাপ্রেমী মনে -

"খোকারও হয়েছে ছেলে দু-বছর হল
আরও মাত্র বছর পঁচিশ ঠাকুর মুখ তোলো"

(বৃদ্ধাশ্রম)

— ঃ —

শিক্ষণ অভিজ্ঞতা

সৌম্যদীপ মণ্ডল

আজ কথা বলবো আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষন অনুশীলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। আচ্ছা প্রথম থেকেই শুরু করি। আমি হলাম গিয়ে সাবড়াকোন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষন সংস্থা ২০২২-২৪ বর্ষে পাঠরত একজন শিক্ষার্থী -শিক্ষক। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে একজন আদর্শ শিক্ষকের যা যা গুণাবলী বা কর্তব্য থাকা প্রয়োজন তা সবারই প্রশিক্ষণ এই প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা হয়। সেই মত প্রশিক্ষণ শেষ হতে না হতেই নিকটবর্তী স্কুলগুলিতে দিন ষাটেকের মত্তে আমাদের শিক্ষন অনুশীলনের জন্য যেতে হয়।

প্রথমবর্ষে থাকাকালীন যখন দাদাদের শিক্ষন অনুশীলন দেখতে যেতাম। তখন ক্লাস -১ এর শিক্ষার্থীদের দেখে চিন্তায় পড়েছিলাম এই খুদে গুলোকে সামলাবো কীভাবে, তাদের কাণ্ড জানেন খাতা দেখাতে এসে দাদাদের কোলে চেপে যেত। তারপর কোলে করে নিয়েই তার বসার জায়গায় যতক্ষণ না দিয়ে আসবে ততক্ষণ সে নামবেই না। সেই মতো দেখতে দেখতে এবার আমাদের পালা চলে এলো। আর সেই অভিজ্ঞতাই আজ আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরবো।

আমার কাছে এই অভিজ্ঞতা ছিল অনেকটাই চানাচুরের মতো কোথাও টক, কোথাও ঝাল আবার বা কোথাও অনেকটা মিষ্টি। তাদের যতটা শেখাতে পেরেছি তার থেকে অনেক বেশী শিক্ষা আমি নিজে পেয়েছি আবার কখনো কখনো কুরচীকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। আবার কখনো তাদের স্নেহ ভালোবাসার মতো মিষ্টি মধুর মুহূর্তেরও সাক্ষী আছি।

দিনটা ছিল ১৯.০২.২০২৪ তারিখ আমার শিক্ষন অনুশীলনের প্রথম দিন। প্রথমে বলে নি যে আমাদের 4 টা স্কুল পড়েছিল ১৫ দিন করে। আমরা ৯ জন ছিলাম 'D' Group এর সদস্য। আমাদের প্রথমেই পড়েছিল 'শালদহ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' যেহেতু প্রথম দিন সেহেতু একটু ঘাবড়েই ছিলাম। আবার প্রথমেই Upper Primary স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সামনা সামনি দাঁড়ালে চেনাই যাবে না কে সে শিক্ষক আর কে ছাত্র। ঠিক হলো আমি ক্লাস V পড়াবো। সেই মত প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে সকল শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয় হয় এইভাবে দুই-তিনদিন চলার পর লক্ষ্য করলাম সে ক্লাসে এমন দুজন মেসে শিক্ষার্থী আছে যারা কোনো কিছুতে responce করে না, ক্লাসের 3 নং বেঞ্চের একধারে দুজন এসে বসে থাকে। কারো সাথে তেমন কথাও বলে না। আমি তাদের সাথে কথা বলতে গেলে আমার কথাতেও কোনো responce তাদের কাছ থেকে তেমন পায় নি। ক্লাসের বাকিদের সাথে কথা বলে যা বুঝলাম তারা হল দুই বোন, একজনের

নাম গঙ্গা আর অপর জনের নাম যমুনা। তারা প্রতিটি ক্লাসেই এমনই চুপচাপ থাকে। এইসব দেখে ভাবলাম তাদের কোনো কাজে উৎসাহ দিতে হবে। সেই মত তার পরের দিন একটা PT ক্লাসের ব্যবস্থা করি এবং PT করতে সকলকে উৎসাহ দিই। তাতে দেখলাম তারা আনন্দের সহিত PT করতে। একই ভাবে আবার কোনো বার চক আনতে পারবে কিনা বলি তারা তাতেও আনন্দের সহিত চক এনে দেয়। এতে বুঝলাম তারা পড়াশোনাটাকে ভয় পাচ্ছে। আমার এই শিক্ষন অনুশীলনে শুধুমাত্র শালদহ স্কুলেই এমন শিক্ষার্থী পেয়েছি এমন নয়, শালদহ ছাড়াও অনান্য তিনটি স্কুলেও কোনো না কোনো ক্লাসে এরকম শিক্ষার্থী আমার চোখে পড়েছে। আমার মতে এমত অবস্থায় আমাদের করণীয় তাদের সাথে বেশী বেশী মিশে একটা বন্ধু সুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বেশী বেশী করে তাদের উৎসাহ প্রদান করা যাতে তারা যে কোনো কাজ উৎসাহের সহিত করতে পারে।

এছাড়াও আবার কখনো এমনও অভিজ্ঞতার সাক্ষী আছি যেখানে শ্রেণী সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে। 'সাবড়াকোন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়ে আমার পড়েছিল ক্লাস -I। প্রথম দু-দিন এদের সামলাতে গিয়ে মাথায় হাত পড়েছিল আমার। দেখতাম তারা ক্লাস চলাকালীনই কেউ কেউ দৌড়ে পালিয়ে যেত মাঠে, কেউ কেউ আবার ক্লাসের মধ্যেই ঝাঁপ-দৌড় শুরু করে দিত। এই সব দেখে চিন্তা করলাম মাঠের মতো পরিবেশ যদি ক্লাস রুমেই আনা যায় তাহলে তো তারা আর ক্লাসের সময় দৌড়ে মাঠ পালাবেন। সেই মত খেলার ছলে শিক্ষাদান শুরু করলাম। সেই মত ক্লাস রুমেই কখনও বিভিন্ন নাটকীয় ভঙ্গিমা করে মুনিরাম মুনসির মতো ছড়া শিখে ফেললাম আবার কখনো চকের টুকরোর সাহায্য নিয়ে আর্যভট্টের আবিস্কৃত শূন্যের ধারণাও অবগত করে ফেললাম।

আবার অন্য আর এক স্কুলে দেখি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা মূলক মনোভাব বেশী, তেমন এক স্কুল হলো 'শালতোড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়'। এই স্কুলে আমার পড়েছিল ক্লাস III। এই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে বুঝলাম তারা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলা খেলতে খুব ভালোবাসে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক খেলা যেমন কুইজ, Word box এইসব। এছাড়াও আর একটা ব্যাপার এখানে দেখে যেটা ভালোলাগল সেটা হল শালতোড়া। সাবড়াকোন বিদ্যালয় দুটিতে খেলাধূলার জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ। সে তুলনায় শালদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিতে খেলাধূলার জন্য ধার্য করা কোনো সময় নেই। পড়াশোনার পাশাপাশি যেমন খেলাধূলোর যে একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক বিকাশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে। তাই স্কুলগুলোতে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলার সময় ধার্য করা উচিত বলে আমার মনে হয়।

বাকী রইল আর একটি স্কুল মাণ্ডি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। এই স্কুলটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলি, সেখানাকার স্থায়ী শিক্ষকদের কথা। সেখানকার স্কুলের শিক্ষকদের বন্ধু সুলভ আচরণ দেখে আমি সত্যিই মনোমুগ্ধ। এই স্কুলে আমার পড়েছিল ক্লাস - II এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে বুঝতে পারলাম এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল ধর্মী মনোভাব প্রকৃতির। দ্বিতীয় শ্রেণিতে একজন ছাত্র ছিল তুষার বলে। কী সুন্দর তার হাতের টান, সে পড়াশোনাতে যেমন পারদর্শী তার সাথে সাথে ছবি আঁকতেও খুব ভালোবাসে। তার আঁকা ছবি দেখলে আপনার অন্তরও বলে উঠবে না 'বেশ সুন্দর'। এছাড়াও একদিন চোখে পড়ল তারা অনেকে বাড়ি থেকে মাটির তৈরী বিভিন্ন বস্তু, হাত দিয়ে তৈরী পাখা তৈরী করে এনেছে। এখান থেকে তাদের সৃজনশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পড়াতে গিয়ে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করি যেটা হল চার্ট জাতীয় শিক্ষন-শিখন উপকরনের থেকে মডেল জাতীয় বস্তু শিক্ষন-শিখন উপকরণ হিসেবে যদি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা হয় তাহলে তারা সেটার প্রতি বা পাঠের প্রতি বেশী মনোযোগী হচ্ছে। সুতরাং পাঠদান চলাকালীন তাদেরকে যেমন বিষয় সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য দেওয়া প্রয়োজন সেরকম উপযুক্ত 3D বা মডেল জাতীয় উপকরণ ব্যবহার করলে সেই শিক্ষা বেশী আকর্ষণীয় হবে এবং স্থায়ী হবে।

এছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেণিতে একজন মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল শুভশ্রী সে খুব চঞ্চল। বেশীর ভাগ সময়ই তার মন থাকত ক্লাসের ওই চার দেওয়ালের বাইরে ওই সবুজ পরিবেশে। আচ্ছা এই শিক্ষ যদি ক্লাসের চারদেয়ালের মাঝে আটকে না রেখে পরিবেশের সাথে মিশে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের যথাযথ সুযোগ বা ব্যবস্থা থাকত তাহলে বোধহয় শিক্ষা গ্রহণে বা পড়াশোনাকে আর কেউ ভয় পেত না। গঙ্গা-যমুনার মতো মেয়েরাও তখন শিক্ষাকে আর ভয় পেত না। তারাও সমান শিক্ষার অধিকারী হতো।

* শিক্ষা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন —

"আমরা চাই সেই শিক্ষা যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়।
মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির প্রসার ঘটে এবং যার দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। ভালো কাজ করার একমাত্র উপায় হলো আপনি যা করেন তা ভালোবাসা। তাই শিক্ষাকে ভয় না পেয়ে, শিক্ষাকে ভালোবাসতে হবে।"

এই ছিল আমার ষাট দিনের শিক্ষন অনুশীলনের অভিজ্ঞতা যেটা আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। নির্বিশেষে একটা কথা বলতে চাই -অনেক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে বিভিন্ন কারন বসত কিন্তু জীবনে চলতে গেলে সামান্যতম হলেও শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন। তাই তো বলা হয়েছে "Education For all" শিক্ষা সবার জন্য।

— ঃ —

"হোস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা"

শোভন ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)

সালটা ছিল ২০২২। সবেমাত্র জীবনের দ্বিতীয় বড়ো পরীক্ষা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলাম এরপর খুব দুশ্চিন্তা হল, যে এবার কি নিয়ে পড়বো বাড়ির এইরকম অবস্থা, আমি ছাড়া বাবা-মা-র পাশে থাকার মতো কেউ নেই। হঠাৎ ঠিক হলো D.EL.ED করবো প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিজেকে সমাজের সামনে আদর্শ মানুষ হিসাবে তুলে ধরবো। কারণ আমরা ভগবানের কৃপায় মানবজীবনে মানুষের জন্য যদি না কিছু করি তাহলে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এমত অবস্থায় আমি ভর্তি হলাম SGPTTI D.EL.ED কলেজে। তারপর থেকেই আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। আমি প্রথম বাবার সাথে এসেছিলাম ভর্তি হতে পরে মায়ের সাথে এসেছিলাম শ্রীসদন ভবনে ঢুকলাম। প্রথম প্রথম খুব একা লাগছিল, অভ্যাস থাকার সেরকম ছিল না বলে। আসতে আসতে সেই জড়তা চীরতরে সেরে গেলো। এমন বন্ধু সত্যিই পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার, যেন মনে হতে লাগল ভগবানের দূত হয়ে আমার কাছে এসেছে। এরকমই একদিন আমার বাবার অ্যাকসিডেন্ট হয় এবং খুব অসহায় হয়ে পড়ি। ঠিক সেই সময় আমার প্রানের চেয়েও প্রিয় বন্ধুরা আমায় সাহায্য করে এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক মহাশয় সাহায্য করেন। এভাবে ধীরে ধীরে আমার বাবা ঠিক হতে থাকে। এমত অবস্থায় দেখতে দেখতে ২ বছর কেটে গেল। JUNE-30 হলেই আমাদের বিদায় ঘন্টা বেজে যাবে কিন্তু আমার মনে ফেলে আসা দিনগুলির ছাপ প্রভাব বিস্তার করবে।

কিছু করার নেই। জীবন বড়োই কঠিন। কালকের সমস্যার জন্য আজ প্রস্তুত থাকতেহবে। এই তো জীবন। তবে যাই হোক আমার মনিকোঠায় মনে থাকবে , বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মুহূর্ত, বাজার যাওয়া, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া। ক্রিকেট খেলার মুহূর্ত আমার আনন্দের এক নতুন চ্যাপ্টার - যেখানে বিকাল হলেই সবাইকে নিয়ে মাঠে গিয়ে ভাগ করে ক্রিকেট খেলা। খেলায় হার-জিত তো থাকবেই কিন্তু আনন্দটাই হল আসল ব্যাপার।
সবারই সাথে ক্যান্টিনে নির্দিষ্ট দুপুর ও রাত্রে খেতে যাওয়া। সত্যিই সব মুহূর্ত যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

— ঃ —

কলেজ ও হোস্টেল এর প্রথম দিন

সায়ক নন্দী (প্রথম বর্ষ)

হোস্টেল জীবন সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। ছোটবেলা থেকে বাড়িতে থেকেই অভ্যস্ত। তাই বাবা যখনই ... আমার হোস্টেল যাওয়ার কথা বলতো, মনে মনে ভয় লাগতো। নিরাপত্তার অভাবের কথাও আমার কোথাও না কোথাও একটু ভয় ছিল। হোস্টেল এ সমস্ত কাজ নিজেই করতে হয়। শুনেছি মাঝে মাঝে আবার মারামারি ও হয়। মা বাবার ভয় সেখানেই। তাও কবির ভাষায় -

'তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

আমি অনেক সরকারি কলেজ এ ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কোথাও হলো না। অগত্যা বাঁকুড়া জেলার সাবড়াকোন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থায় ভর্তির জন্য আবেদন করলাম। ভাগ্যবশতঃ সেখানে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বাড়ি থেকে দুরে হলেও এটি পুরানো স্বনামধন্য কলেজ। দিনটা ছিল সোমবার সকাল সাতটাই কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাড়ি থেকে দূরে যেতে যেমন কষ্টও লাগছিল তেমনি আবার মনটা কিছুটা অনাবিল আনন্দে ভরে উঠলো। যাইহোক, কিছু সময়ের ব্যবধানে কলেজে গিয়ে হাজির হলাম। পৌঁছানোর পর কলেজ এবং হোস্টেল ঘুরে ফিরে দেখলাম। কলেজ এর সু-উচ্চ ভবনগলি আমাকে মোহিত করল। ধীরে ধীরে অন্যান্য সমস্ত ছাত্ররা আসতে লাগলো। আমার রুমমেট এর সাথেও পরিচয় হলো অন্যান্য সব ছাত্রদের সাথে পরিচয়ও হল। কেউ এসেছে মেদনীপুর থেকে আবার কেউ এসেছে সুদূর কমলপুর থেকে, সব মুখগুলো অপরিচিত। কিন্তু টের পাচ্ছিলাম। এই মানুষগুলোর সঙ্গেই আগামী দুই বছরের একটা বড় সময় কাটবে। এরপর কলেজ পৌঁছানোর কিছুক্ষন পরই শুরু হল ক্লাস, কেমন যেন একটা ভয় আবার একই সঙ্গে আনন্দে বুক কাঁপছিল। ক্লাস নিলেন কলেজেরই অধ্যক্ষ শ্রী মনোজ কুমার পাণ্ডে মহাশয়। ছিপছিপে গড়নের মানুটির বাচনভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করলো। তারপর অন্যান্য ক্লাস হলো। প্রতিটি ক্লাসই আমার কাছে ছিল উপভোগ্য। কলেজ জীবনের প্রথম দিনেই আমি স্বাধীন জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করলাম। কিন্তু সময়ের অপব্যবহার করলে চলবে না। পরিশেষে বলাই যায় যে চলমানতাই হলো কলেজ জীবনের ধর্ম।

— ঃ —

বাহা উৎসব

ইন্দ্রজিৎ হাঁসদা (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাহা কথাটির অর্থ হল ফুল বা প্রকৃতির নতুন গাছপাতার সৃষ্টি এককথায় বলা যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আমাদের আর কয়েকটি উৎসবের মধ্যে যেমন - সোহরায়, সাকরাও, সাহঃমড়ে এই উৎসবের মধ্যে বাহা একটি অন্যতম উৎসব। এই বাহা উৎসবটি বাংলার শেষ মাসে পালিত হয় অর্থাৎ চৈত্র মাসে আর ইংরেজী মার্চ ও এপ্রিল মাসে পালিত হয়। আমার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গাতে গ্রামের নাম বেড়োবাইদ। আমাদের গ্রাম অনেক বড়ো যেখানে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোক একসাথে বাস করে তার মধ্যে আমাদের গ্রামে সাঁওতাল প্রায় ৫০টি বাড়ি আছে।

আমি ছোটবেলা থেকেই হোস্টেলে থাকি যখন এই বাহা উৎসবটি আমাদের গ্রামে পালন করা হয় তার ৪-৫ দিন আগে আমি বাড়ি যায়। এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন যেমন মামা-মামি, মাসি, পিসি সবাইকে আমাদের বাড়ীতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করি তারা আমাদের বাড়িতে আসে উৎসবের দিনে। যে দিন আমাদের বাড়িতে আত্মীয় আসে আমার খুব ভালো লাগে। খুব আনন্দ করি। আমাদের গ্রামে এই উৎসবটি তিনদিন হয়। এই তিন দিনের নাম আছে এই তিন দিনের নাম হল প্রথম দিনকে বলা হয় উম যাহা অর্থাৎ শুভ সূচনা, দ্বিতীয় দিনের নাম সারদি মাহা-মানে মূল পূজানুষ্ঠান আর তৃতীয় দিন বলা হয় বাস্কে মাহা বা জালে যাহা অর্থাৎ পূজার শেষ দিন। তার আগে বলে দিয় মাহা কথার অর্থ হল দিন।

প্রথম দিন অর্থাৎ উম মাহা ঃ- এই দিনে সকালে গ্রামের ছেলেরা সবাই মাঞ্জি বাড়িতে উপস্থিত হয়। এই মাঞ্জি হল গ্রামের প্রধান নায়কে, জোগ মাঞ্জি। এদের সবার আলাদা আলাদা কাজ আছে যেমন নায়কের কাজ হল পূজা করা মানে পুরোহিত। তাদের বাড়িতে গিয়ে। পূজা নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর আমরা গ্রামের ছেলেরা জাহের খান অর্থাৎ মন্দিরে গিয়ে সেখানে মন্দিরকে পরিষ্কার বা সাজানো হয়। আমি বা আমার গ্রামের বন্ধু মিলে জাহের থান খুব মোজা ও আনন্দ করে পরিষ্কার করি। সেখানে আমাদের থেকে বড়োরা থাকেন আমাদের সাহায্য করে দেন এবং বলেদেন যে এই কাজগুলো করো। আমাদের জাহের থানটি বনের মাঝে। সেখানে অনেক শাল গাছ আছে। শাল গাছের ঠিক নিচে থাকে থানটি। জাহের থানটি পরিষ্কার হওয়ার পর যিনি পূজো করেন নায়কে তিনি একটি কুড়ে ঘরে মতো তৈরি করেন এবং তার নিচে গোবর দিয়ে ঘষে দেন। এই গুলো করতে করতে প্রায় দুপুর ২টা বেজে যায়। তারপর বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া করি। তারপর বাড়িতে দিদি, মামি-মামাদের সাথে কথা বলি।

আজকে রাত ৯টা বাজলে মাঞ্জি বাড়ি যেতে হবে। আমরা সবাই তৈরি হলাম মাঞ্জিদের

বাড়ি যাওয়ার জন্য এবং গ্রামের লোকেরাও। মাঞ্জিদের বাড়ি যাওয়ার জন্য যে পোষাকটি আমাদের পরে যেতে হয় ছেলেদেরকে পাঞ্জি ধুতি ও মেয়েদেরকে পাঞ্জি শাড়ি পড়তে হবে। না পরলে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমরা সবাই রেডি হলাম তারপর খুব আনন্দ, মোজা করে গেলাম মাঞ্জি বাড়িতে গিয়ে সেখানে ছেলেদের জন্য আলাদা জায়গা ও মেয়েদের জন্য আলাদা জায়গায় দাঁড়াতে হয়। এরপর নায়কে দ্বরে একটি ছোট মন্দির আছে যেখানে পূজো করে। অর্থাৎ মারাং বুরু, জাহের আয়ো এবং মড়েকো তুরুরকো তাদের পূজার ডাকা হয়। এবং ধামসা মাদল বাজাতে বাজাতে নাচ করি আমরা আর মেয়েরাও নাচ করে হাত ধরে। এবং নাচতে নাচতে কোনো একটি ছেলের মধ্যে মারাং বুরু জাহের আয়ো তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এবং নাচ গান হয়। প্রায় নাচ গান ২ ঘন্টা হয়। এবং যাদের শরীরের মারাং বুরু জাহের আয়ো প্রবেশ করেছিল তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর নাচ, গান শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই বাড়ি ফিরে যায়। এবং পরের দিন আবার জাহের থানে যেতে হবে।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ সারদি মাহাঃ- এই দিনে সবাইকে স্নান করে কিছু না খেয়ে মাঞ্জি বাড়িতে প্রথমে যেতে হবে। সেখানে পুজো হওয়ার পর আগের দিনের মতো কিছু জনের শরীরে, মারংবুরু জাহের আয়ো প্রবেশ করে। মারংবুরু হল সাঁওতালদের দেবতা আর জাহের আয়ো হল মাতা। এরপর আমরা সবাই মাঞ্জি বাড়ি থেকে জাহের থানের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে গিয়ে যিনি পূজো করেন নায়কে তিনি পূজো করেন জাহের থানে। আমাদের জাহের থানে হাতি, ঘোড়া, মূর্তি থাকে। পূজো শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রসাদ দেওয়া হয়। এরপর রান্না হয় খিচুড়ি তৈরী হতে বিকেল ৫টা বেজে যায়। খিচুড়ি খাওয়া সবার কার হয়ে যাওয়ার পর আবার নাচ গান হয় এবং নাচ গানের মাধ্যমে নায়কে কে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিন বাস্কে মাহা ঃ- এই দিনে সবাই খুব মোজা করে। এবং ধামসা মাদল বাজিয়ে খুব নাচ করে। হোলিতে যেমন রং মেখে আনন্দ করা হয় এখানে রঙের পরিবর্তে জল দিয়ে আনন্দ করা হয়।

এরপর উৎসব শেষ হওয়ার পর আমাদের বাড়িতে মামা, মাসি, পিসি তারা তাদের বাড়ি ফিরে যায় তখন আমার খুব খারাপ লাগে। তখন আমি মনে মনে ভাবি পরের বছর ঠিক এই সময়ে আবার হবে।

— ঃ —

শিক্ষার্থীদের প্রতি

সুমন মণ্ডল

ছাত্র-ছাত্রীরা হল জাতির ভবিষ্যৎ, নেতা ও উদ্ধার কর্তা। যুব সমাজ যদি সঠিক পথে না চলে তাহলে ঐ জাতি নিদারুন দুঃখ কষ্টে পড়বে ও সমাজ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাবে। সমগ্র দেশ যুগযন্ত্রণার শিকার হয়ে গভীর সংকটে পড়বে। চারা গাছ যদি একটু বাঁকা থাকে তাহলে গাছটিও বাঁকা হয়ে উঠবে।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যঢ়াস হলো মানব জীবনের চারটি ধাপ। ছাত্র জীবন হলো ব্রহ্মচর্য ধাপ। আমাদের জীবন প্রাসাদের বুনিয়াদ। বুনিয়াদ শক্ত পোক্ত হলে যেমন প্রাসাদের অন্যান্য তালাগুলি সুরক্ষিত থাকে তেমনি ছাত্র জীবনে যদি শক্তিশালী ব্রহ্মচর্য্য দিয়ে গঠন করা যায় তবে জীবনের বাকী ধাপগুলি আপনা আপনি মজবুত হয়ে উঠবে। এই যুগকে বস্তুতঃ মানব জীবনের "স্বর্ণ যুগ" বলা হয়। সুতরাং ছাত্র সমাজকে সৎগুণের অধিকারী হতে হবে। তাদের দৃষ্টি শ্রবণ, কথা ও কর্ম এসবগুলি পবিত্র হবে।

ছাত্র সমাজের হৃদয় হলো জলের ট্যাঙ্কের মতো। যেমন জল ভর্তি করা হবে ইন্দ্রিয়ের কল দিয়ে তাই বেরবে। অর্থাৎ তাদের অনুভূতি যেমন হবে তেমন কর্ম হবে। একটি কুয়োতে যদি একটি ঢিল ছোঁড়া হয় তাহলে পুরো কুয়োটিতে ক্ষুদ্র ঢেউ এর সৃষ্টি করবে। তেমনি মন রূন হ্রদে ভাল, মন্দ চিন্তার নুড়ি ছুড়ে দিলে তার প্রভাব শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে। কোন মন্দ চিন্তা যদি প্রবেশ করে তবে কথা হবে মন্দ। চক্ষু মন্দ দেখবে, কান মন্দ শুনবে, হাত মন্দ কাজ করবে, পা মন্দ স্থানে যাবে। চিন্তার প্রভাব পায়ের আঙ্গুল থেকে সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে যাবে। যেমনভাবে কুয়োতে সামান্য ঢিল ছোঁড়ায় গোটা কুয়োতে ঢেউ ছড়িয়ে যায়। মন হল চিন্তার ভাণ্ডার, কিন্তু অপর লোকদের চিন্তাকে জানতে আমরা সমর্থ নই। এমনকি একটি কুকুরও মানুষের চিন্তাকে জানতে পারে।

একটি কুকুর পাঁচ মিটার দূরে কোন স্থানে শুয়ে আছে। কুকুরটিকে যদি নজর না দিয়ে ঐ দিকে যাওয়া হয় তবে কুকুরটিও নড়াচড়া করে না সে নির্বিকার শুয়ে থাকে কিন্তু ঐ কুকুরটিকে ঢিল ছোঁড়ার জন্য যাওয়া হয় তাহলে সে দেখা মাত্র ছুটে পালাবে। এর অর্থ হলো কুকুর মানুষদের চিন্তাকে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মানুষ তার সব মানবদের চিন্তাকে বুঝতে পারে না।

ইংরেজিতে কুকুর কথাটির অর্থ হল DOG তিনটি অক্ষর রয়েছে। আমরা যদি ঐ অক্ষরগুলোর বিন্যাস উল্টে দিয়ে থাকি তাহলে তা দাঁড়াবে GOD মানে ভগবান। তাই ছাত্র সমাজের উচিত GOD হয়ে ওঠা DOG নয়।

— ঃ —

কলিযুগের স্বর্গপুরী

সুমন বাউরী (দ্বিতীয় বর্ষ)

স্বর্গের প্রমোদ উদ্যানে বসে বাদাম ভাজা খেতে খেতে আলোচনায় রত দেবরাজ ইন্দ্র, ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব মহাদেব।

(নারদের প্রবেশ - পরনে শার্ট ও জিনসের প্যান্ট, পায়ে অজন্তা হাওয়াই চপ্পল, চোখে সানগ্লাস)

নারদ ঃ হায়-হায়-হায়।

ইন্দ্র ঃ আরে দেবর্ষি যে এসো এসো, তা তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না। আর তোমার সেই চিরাচরিত 'নারায়ণ-নারায়ণ' ডাক তো শুনলাম না।

নারদ ঃ স্যার, ওটা Old হয়ে গেছে। তাই ওটাকে বাদ দিয়ে এই New Version 'হায়' শব্দটা বলছি।

কৃষ্ণ ঃ আচ্ছা দেবর্ষি, তোমার নিজস্ব পোশাক ছেড়ে এসব কী পরেছো? একি! পায়ে খড়মও নেই। চোখে কালোমতো ওটা কি?

নারদ ঃ স্যার, আপনি আমাকে মাস দুয়েক আগে বলেছিলেন যে, মর্ত্যলোক থেকে ঘুরে আসতে এবং সেখানকার পরিস্থিতি কেমন চলছে দেখে আসতে।

কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ বলেছিলাম। তা মর্ত্যলোক থেকে ফিরে তুমি নিজের বেশভূষা পাল্টে ফেলেছ যে। প্রভুর জায়গায় 'স্যার' বলছ।

নারদ ঃ হ্যাঁ স্যার, মর্ত্যলোকে আমি প্রথমে ইণ্ডিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম যুবক-যুবতীরা পরস্পর দেখা হলে 'হায়-হায়' বলছে, আর হাত নাড়ছে। আমি ঠিক করলাম এটাই আমাকে চালাতে হবে। আবার দেখলাম যুবকেরা জিনসের প্যান্ট ও শার্ট পরছে, এতে তাদের অনেক স্মার্ট ও হ্যান্ডসাম লাগছে। আর ভারতবর্ষে যা রৌদ্র তাতে চোখ জ্বালা করছিল, তাই বাধ্য হয়ে এই সানগ্লাস নিতে হল এবং ভারতবর্ষ পাহাড়ের দেশ, ঐ সব এলাকায় খড়ম পরে ঘুরে ঘুরে পায়ে আঁকড় পড়ে গেছে, তাই অজন্তা হাওয়াই চপ্পল কিনে ফেললাম।

ইন্দ্র ঃ কি করেছো দেবর্ষি? আমাদের সৃষ্ট জীবেদের তুমি অনুকরণ করছো, এতো দেবতাদের লজ্জার ব্যাপার।

নারদ ঃ না স্যার, আমি এখন আর ওটা মানতে রাজী নই, মর্ত্যে জাতিভেদ নেই বললেই চলে, কাজেই দেবতা আর মানুষে ভেদ রাখা চলবে না। উল্টো আমাদেরই ওদের অণুকরণ করতে হবে।

ইন্দ্র ঃ তা দেবর্ষি, ইণ্ডিয়া তো ঘুরলে, সেখানকার পরিস্থিতি কেমন?

নারদ ঃ স্যার পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। বন্যা, বোমা বিস্ফোরন, বিশেষ করে মহামারী যে হারে হচ্ছে, তা ধরতে পারেন মর্ত্যের মানুষ ভীষন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, এই তো ২০২০ সালের করোনা তে কত যে মানুষ মরলো গুনে শেষ করা যায় না। আবার জিনিসপত্রের দামও চরম হয়ে উঠেছে। তবে স্যার এল.সি.ডি আর K.T.M এর দাম কমেছে। এবার হাতে বেশি টাকা থাকে নি, পরের বার যখন মর্ত্যে যাব তখন একটি এল.সি.ডি আর একটা K.T.M কিনে আনব।

ইন্দ্র ঃ হ্যাঁ, আমিও K.T.M নামটা শুনেছি। গাড়িটা নাকি খুব সুন্দর করেছে, পাঁচখানা গিয়ার এবং অতি দ্রুত গতিতে চলে। কি হে ভোলানাথ, তুমি কি বল?

শিব ঃ (সিগারেট ধরাইয়া) তা তুমি কথাটা মন্দ বলনি দেবরাজ। ওই রকমই গাড়ি এখানে চাই।

নারদ ঃ এ কি স্যার! আপনি সিগারেট খাচ্ছেন!

শিব ঃ হাসালে দেবর্ষি, তোমাকে পাঠিয়েছিলাম মর্ত্যধামে ঘুরে আসতে, আমরা তো এখানে বসেই সব দেখতি পাচ্ছি। শোন গাঁজা, ভাঙ, মদ এমনকি বিষেও আমার নেশা মেটেনি তাই ভাবছি এবার হেরোইনটা টেস্ট করবো। এবার একটু Modern হতে হবে।

নারদ ঃ ঠিক বলেছেন স্যার।

(দুর্গার প্রবেশ পরণে শাড়ি, হাতে আয়না ও চিরুণী)

দুর্গা ঃ প্রভু (শিবকে), কার্তিক এখনও ফিরেনি? আমাকে Disco তে যেতে হবে।

শিব ঃ কার্তিক কোথায় গেছে?

দুর্গা ঃ ও এক বান্ধবীর সাথে দেখা করতে গেছে।

নারদ ঃ Hi-Madam

দুর্গা ঃ Who are you?

নারদ ঃ আমাকে চিনতে পারছেন না Madam, আমি দেবর্ষি নারদ।

দুর্গা ঃ আরে তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না, নিজেকে প্রায় বদলে ফেলেছ। বর্তমান কালের সাথে তাল মিলিয়ে চলাই ভালো। ও প্রভু (শিবকে), আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি আসছি। (দুর্গার গমন)

ইন্দ্র ঃ আচ্ছা দেবর্ষি, তুমি হঠাৎ 'প্রভু' ছেড়ে স্যার বলছ ওটাও কী ... (মাথা নেড়ে)

নারদ ঃ Yes Sir, মর্ত্যে দেখলাম বসকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করছে। তাই আমিও .... তা মহাদেব স্যার কি যেন বলেছিলেন হেরোইন ধরবেন।

শিব ঃ হ্যাঁ দেবর্ষি, তাই ভাবছি। কি বলহে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই তো।

শিব ঃ কি ব্যাপার হে? তুমি কি বসে বসে শ্রীরাধার ধ্যান করছিলে নাকি? তুমি না জিনিয়াস Uff কুরুক্ষেত্রে কি খেলাটাই না দেখালে মাইরি।

কৃষ্ণ ঃ না-না মহাদেব। মর্ত্য থেকে প্রেম সম্বন্ধীয় সমস্যার কিছু list আমার কাছে এসেছে। ওগুলো আমি Radio Mirchi -র Doctor 'Love' এর কাছে পাঠাব কি না সেই নিয়ে ভাবছি।

ইন্দ্র ঃ আচ্ছা দেবর্ষি, মর্ত্যে মানুষ কি এখনও বোকা আছে?

নারদ ঃ না স্যার, ছিল বছর কুড়ি আগে, এরপর স্বাক্ষরতা প্রকল্প চালু করে ক্রমশই সবাই চালাক হয়ে উঠেছে। আপনার মনে নেই কতদিন আগে মানুষ চাঁদে চলে এসেছে, আর একলাফ দিলে কিস্তিমাত একেবারে স্বর্গে।

ইন্দ্র ঃ তাহলে এখনও বিপদে পড়লে মানুষ আমাদের ডাকে কেন?

নারদ ঃ স্যার, এটাও বুঝতে পারেন না, ডাকে আমাদের বোকা বানাবার জন্য।

কৃষ্ণ ঃ দেবর্ষি, তুমি এখন এসো। আমাদের একটু আলোচনা করতে দাও।

নারদ ঃ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা মহাদেব স্যার, লক্ষ্মী Madam কে এখন কোথায় পাব?

শিব ঃ কেন? ওর সাথে তোমার কি দরকার দেবর্ষি?

নারদ ঃ দরকার সামান্য স্যার, লক্ষ্মী Madam কে বলতাম যেন ওনার ঝাঁপিকে সামলে রাখেন।

শিব ঃ ওতো Shopping করতে গেছে।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ ঃ দু-হাতে ব্যাগ ভর্তি)

লক্ষ্মী ঃ আমাকে কিছু বলছিলে বাপী।

শিব ঃ তুই এসেছিস মা - দেবর্ষি তোর খবর নিচ্ছিল।

লক্ষ্মী ঃ কেমন আছেন দেবর্ষি? আমার সম্বন্ধে কী বলছিলেন?

নারদ ঃ ভালো। আপনার ঝাঁপিকে সামলে রাখার কথা বলছিলাম Madam

লক্ষ্মী ঃ সে ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ওটা আমি Locker এ রেখে দিয়েছি। বাপী (শিবকে), মা কোথায়?

শিব ঃ তোর মা Disco তে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। দেখ, ভিতরে যা ... ।

(লক্ষ্মীর গমন)

(কার্তিকের প্রবেশ হাতে মোবাইল ফোন, বাম হাতে স্টাইলস ঘড়ি, পরনে জিনসের প্যান্ট, সার্ট, গলায় ব্লু টুফ হেডফোন, পায়ে ফুল সু, চোখে চশমা)

কার্তিক ঃ Dad, mom কি Disco তে চলে গেছে?

শিব ঃ কার্তিক, তোর কি এখন আসার সময়? বান্ধবীর সাথে অত গল্প কিসের ....।

কার্তিক ঃ Cool dad, Cool. It's my Style (কার্তিকের গমন)

নারদ ঃ স্যার, কার্তিক Cool বলে গেল, এটার মানে কি?

শিব ঃ Cool মানে ....। আচ্ছা সরস্বতী আসুক জেনে নেব।

নারদ ঃ সরস্বতী Madam কোথায় গেছে স্যার?

শিব ঃ ও Computer Class এ গেছে।

(স্বরস্বতীর প্রবেশ - হাতে বই, কাঁধে ব্যাগ)

সরস্বতী ঃ বাবা, একটু দেরী হয়ে গেল। পাপড়ি চাট খাচ্ছিলাম। তোমার জন্যেও এনেছি।

শিব ঃ ঠিক আছে ভিতরে নিয়ে যা। ও ... সরস্বতী দেবর্ষি Cool মানে জানতে চাইছিল।

সরস্বতী ঃ Cool মানে ঠাণ্ডা। (সরস্বতীর গমন)

নারদ ঃ আচ্ছা আমরা তো এখন A.C. Room এর মধ্যে। ও ... তাই কার্তিক Cool বলে গেল।

(গনেশের প্রবেশ)

গনেশ ঃ প্রণাম।

শিব ঃ আয়।

নারদ ঃ ইনাকে তো চিনতে পারলাম না স্যার।

শিব ঃ চিনতে পারলে না, গনেশ।

নারদ ঃ এ কি গনেশ। তোমার শুঁড় কোথায়?

গনেশ ঃ ওটা কসমেটিক সার্জারি করিয়ে ফেলেছি।

শিব ঃ গনেশ তোর মা বোধহয় তোকে ডাকছে। (গনেশের গমন)

নারদ ঃ স্যার, আমি দু-মাস মর্ত্যে ঘুরে ভাবলাম নিজেকে বদলে ফেলেছি। কিন্তু এখানে ফিরে এসে দেখলাম পুরো স্বর্গপুরীই বদলে গেছে।

শিব ঃ তা একটু মডার্ণ না হলে চলবে কি দেবর্ষি?

নারদ ঃ তাহলে আসি স্যার, Bye-Bye-Bye

ইন্দ্র ঃ তাহলে আমাদের আলোচনা সভা এখানেই সমাপ্ত করা হোক।

কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ চলো, যাওয়া যাক।

কৃষ্ণ ও ইন্দ্র ঃ Bye মহাদেব Bye, See you again.

— ঃ —

নিঝুম রাতে ভূতের সাথে

কৌশিক ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)

রাত তখন সাড়ে বারোটা। আর কয়েকদিন পর আমার ফাইনাল পরীক্ষা। আমাকে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে তাই আমি রাত জেগে পড়াশোনা করছিলাম এবং বাড়ির বাকিরা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। আমি একা পড়ছি হঠাৎ দেখলাম যে দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। আমার খুব ভয় পাচ্ছিল কারন, সবাই ঘুমাচ্ছে আমি একা জেগে আছি। তারপর মনে সাহস জাগিয়ে দেখতে গেলাম যে কে, দেখলাম একটা বিড়াল দরজার কাছে ধাক্কা দিচ্ছিল। বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আবার পড়তে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আরও একটা আওয়াজ আমার কানে এলো। তখন আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমার পাশে ভাই ঘুমাচ্ছে ছোটো ছেলে যদি ভয় পায় তাই তাকে আর জাগায়নি। নীচে দাদু ঘুমাচ্ছিল বয়স্ক মানুষ তাকেও কিছু বলিনি যদি টেনশেন করে। আমি একা কিছুক্ষণ ভাবলাম তখন ও সেই আওয়াজটা আমার কানে ভেসে আসছে। আমি রুম থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দেখলাম কোথাও কিছু নাই কিন্তু সেই আওয়াজটা আমার কানে ভেসে আসছে। ছাদে গিয়ে দেখলাম চারিদিকে তাকালাম কিছু দেখতে পেলাম না। তখন কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমার হাতে থাকা টর্চটিকে জ্বালালাম হঠাৎ দেখলাম যে আমাদের ঘরের পেছনের জমিটাতে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। রাত তখন একটা প্রায়। আমি একা জেগে আছি, সবাই নিঃস্তব্ধে ঘুমাচ্ছে। আমি নিঃস্তব্ধের মতো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সেই শব্দটা আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ছাদ থেকে নেমে টর্চটা হাতে নিয়ে বাড়ির পিছনে সেই জমিটার কাছে গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে লাঠিতে একটা সাদা জামা পরানো আছে। ওটা দেখে আমি বাড়িতে ফিরে এলাম, একটু জল খেয়ে আবার যেই পড়তে বসবো তখন দেখি দাদু বিছানাতে বসে আছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে আমি কোথায় গিয়েছিলাম। আমি সব কথা দাদুকে বললাম। দাদু সব কথা শুনে হেসে বলল যে ওটা তোর বাবা জমিতে দিয়েছে যাতে পাখিরা ফসলগুলো নষ্ট করতে না পারে। আমি সব শুনে বুঝতে পারলাম যে ঘটনাটি কি। দাদু আমাকে বলল যে ভূত বলে কিছুই নেই, সব মনের ভুল। এবং আরও বললো যে রাত অনেক হয়েছে শুয়ে পড়তে। আমি বইগুলো রেখে শুয়ে পড়লাম। পরদিন ঘুম থেকে উঠে বসন্তের সকালটা রোদে চারিদিকে ঝলমল করছিল।

— ঃ —

এক ভূতুড়ে কাণ্ড

সত্যজিৎ রায়

একদিন আমি বিষ্ণুপুরে মাসিবাড়ি যাচ্ছিলাম। দিনটা ছিল রবিবার। আমি বাসে করে যাচ্ছিলাম। আমি দুইবার বাস পাল্টে একটি মোড়ে নেমেছিলাম। এখনও মোটামুটি ২ কিমি রাস্তা বাকি ছিল। সেই রাস্তায় কোনো রিক্সা বা ট্যাক্সি যেত না। মোড়ে একটি বাসযাত্রী প্রতীক্ষালয় ছিল। সেখানে আমি একটু বসে বিশ্রাম করছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি ছেলে এসে হাজির। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল তোমার নাম কী রজেশ? তুমি কি সঞ্জয় রায়ের বাড়ি যাবে? আমি হ্যাঁ বললাম । তারপর ছেলেটির সাথে আলাপ হল। আমরা দুইজন সাইকেলে করে যেতে লাগলাম। সন্ধে হতে আর বেশি সময় নেই। রাস্তায় যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য আমরা বনের পথ ধরলাম। বনের মাঝে একটি আমবাগান ছিল। আমরা এবার আমবাগানে প্রবেশ করলাম। আমবাগানটা বেশি বড়ো নয়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই বেশি অন্ধকার নেমে এসেছিল, পথটি পুরো নির্জন ছিল। আমরা টর্চলাইট জ্বেলেছিলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম একটি লোক একটি বড়ো আম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের একটু সাহস হলো। আমরা দুজন দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে লাইট ফেললাম। তার পরের মুহূর্ত দেখে গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। আমরা দেখলাম যে লোকটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল বলে মনে হয়েছিল সে আসলে গলায় দড়ি নিয়েছে। আমি দেখে আর থাকতে পারলাম না; চোখগুলো ভয়ে বন্ধ করে ফেললাম। দুজনেই সাইকেল ফেলে দৌড় দিলাম। আজ পর্যন্ত কোনোদিন ঐ রাস্তায় যাইনি।

— ঃ —

আকাঙ্খাই দুঃখের কারন, আকাঙ্খা শেষ হলেই মুক্তি।

— গৌতম বুদ্ধ

ছেলেবেলা

পীযূষ নন্দী (প্রথম বর্ষ)

কার বা ফিরে যেতে ইচ্ছে না করে সেই ছোট্টো মিষ্টি ছোটবেলায়। সত্যি বলতে আমি নিজেও ফিরে যেতে চাই আমার সেই ছোটোবেলায়। যেখানে ছিল না কোনো দুঃখ কষ্ট বেদনা। শুধু ছিল এক মিষ্টি সকাল যা মাতিয়ে রাখতো সারাদিন। আজ আমরা সত্যি মনে করি সেই ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো যার মধ্যে ভালোবাসা, আনন্দ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু আজ জীবন জমে গেছে ঘরের এককোণে, যার কোনো স্বাদ বা গন্ধ নেয়। আছে শুধু অস্তিত্ব। প্রকৃতির নিয়মে প্রত্যেক মানুষকেই জীবনের প্রধান চারটি অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়, যথা- শৈশব, কৈশর, যৌবন ও বার্ধক্য। তবে প্রধান এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে শৈশব ও কৈশর যাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে 'ছেলেবেলা' বলে থাকি। তার স্মৃতিগুলি হল রঙিন ও সজীবতায় পরিপূর্ণ। দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ এবং সংসারের নানা জটিলতার সাথে আবদ্ধ থাকে না। এই রঙিন সময়কালটি; আর তাই হয়তো ছেলেবেলাকার স্মৃতি এতটাই সুখের। সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে আমাদের সকলেরই বয়স বেড়েছে, সকলেই হয়ে উঠেছি কর্মব্যস্ত। কিন্তু কিছু মুহূর্ত থাকে যা সেই ফেলে আসা ছেলেবেলাকার স্মৃতিগুলোকে আবার তাজা করে দেয়, আবার নতুন করে ফিরে পাই পুরোনো সেই দিনগুলিকে। দৈনন্দিন রুটিনে বাঁধা ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে উকি মারে ছেলেবেলার নিষ্পাপ মনটা আর সরলতম অনুভূতিগুলি। তাই ইচ্ছে করে আবার একবার ছোটোবেলাতে ফিরে যাই যেখানে শুধু মজা আর মজা, দুঃখ, কষ্ট, চিন্তাভাবনা কিছুই নেই। ছোটোদের আজ সময় কাটে হাতে হাতে ইন্টারনেটে যা আগে কাটতো দৌড়ে, লাফিয়ে পায়ে পায়ে খেলার মাঠে। ভুল করার সময়ই হল ছেলেবেলা। যেখানে মানুষ ভুল শেখার জন্য। স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সবথেকে দরকারী একটি সুন্দর এবং কৌতুহলী শৈশবের।

"একবার যদি আবার ফিরে পেতাম ছোটোবেলা,
কে আর চাইতো সহ্য করতে বড় হওয়ার এই জালা!"

জীবনের সব ধাতুর মধ্যে সবথেকে আনন্দদায়ক হল ছেলেবেলার মরশুম। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব সবথেকে সুখময় একটি স্মৃতি যা কখনো ভোলা যায় না। নিজের ছেলেবেলার গল্প শোনার থেকে আনন্দদায়ক আর কিছু হতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে মনে করি সেই মিষ্টি দিনের কথা, মুহূর্ত যেগুলি আর ফিরে পাবো না। তাই সবশেষে বলতে হয় এই যে —

"Childhood is the best Past of my life."

— ঃ —

রূপকথার গল্প

শত্রুঘ্ন প্রামাণিক (প্রথম বর্ষ)

একবার এক দেশে একজন রাজা ছিলেন। রাজার রাজ্যে একটি সুন্দর বাগান বাড়ি ছিল। সেখানে খুব সুন্দর ফুল ও ফলের গাছ ছিল। ফুলের সুগন্ধ ও ফলের স্বাদ ছিল খুব সুস্বাদু। ঐ বাগানে একটি সুন্দর আপেল গাছ ছিল। যে গাছের আপেলগুলি পাকলে সোনায় পরিণত হত। গাছে অনেক আপেল হল, সময় মত আপেলগুলি পাকতে শুরু করল এবং সোনার ফলে পরিণত হল। পাহারাদার সমস্ত ফল গুনে রাখল। একদিন পাহারাদার রাজাকে এসে জানাল গাছের একটি ফল চুরি হয়ে গেছে। রাজা বলল কে এমন আছে যে ফল চোরকে ধরতে পারবে। সেই রাজার তিন পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে বড় রাজকুমার বলল, 'আমি আজ পাহারাদেব এবং কে সেই সোনার ফল চুরি করেছে তাকে ধরে নিয়ে রাজার কাছে পেশ করব। রাত্রিবেলায় পাহারা দেবার সময় বড় রাজকুমার কোনো এক সময় ঘুমিয়ে পড়লে পরদিন সকালে ফল গুনে দেখা হল এবং একটি ফল কম হল। তখন রাজা বড় রাজকুমারকে রাজ্য থেকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। বড় রাজকুমার রাজ্য ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে সেখানে এক শেয়াল এর সাথে তার দেখা হল এবং সে রাজকুমারের সাথে কি হয়েছিল তা জানতে পারে। তখন শেয়াল বলল যে, 'আমি তোমাকে যে রাস্তা বলে দিচ্ছি সেই রাস্তায় গেলে তুমি সোনার আপেলের সন্ধান পাবে।' তুমি সোজা রাস্তায় গেলে একটি খুব সুন্দর চৌমাথা পাবে এবং একটি খুব খারাপ চৌমাথা পাবে। সুন্দর চৌমাথায় না গিয়ে কুৎসিত চৌমাথা দিয়ে যাবে। কিন্তু রাজকুমার যখন সুন্দর চৌমাথায় পৌছোল সেখানে শেয়ালের কথা না মেনে সুন্দর চৌমাথা দিয়ে গেল এবং সেখান থেকে এক গ্রামে গেল আর সে ফিরল না। এদিকে পরদিন কে আপেল গাছের সোনার আপেল পাহারা দেবে রাজা জানতে চাইল। তখন মেজ রাজকুমার বলল যে পাহারা দেবে। সারা রাত জেগে মেজ রাজকুমার পাহারা দিল কিন্তু কোনো একসময় সেও ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন যখন ফলগুলি গোনা হল আবার ও একটি ফল কম হল। কথামত রাজা মেজ রাজকুমারকেও রাজ্য থেকে চলে যেতে বলল। বড় রাজকুমারের যা ঘটেছিল তার সাথে ঠিক একই ঘটনা ঘটল। শেয়াল বলা সত্ত্বেও সে বড় রাজকুমারের মত একই কাজ করল এবং গ্রামে গিয়ে আর ফিরল না। তখন শেষ রইল ছোট রাজকুমার। সে জানালো পরদিন পাহারা দেবে সে। কিন্তু রাজার ছোটো ছেলের উপর কোনো ভরসা ছিল না। তা সত্ত্বেও ছোট রাজকুমার পরদিন আপেল গাছটি পাহারা দিতে লাগল। রাত গভীর হল, এমন সময় ছোটো রাজকুমার দেখল একটি সোনার পাখি গাছ থেকে ফল চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে তখন সে তীর দিয়ে পাখিটিকে আঘাত করল , কিন্তু তাতে

তার গায়ে লাগল, কিন্তু তার কিছুই হল না। শুধু একটি পালক পড়ে গেল। পালকটি খুব সুন্দর ছিল এবং সোনার পালক নিয়ে সোনার পাখির খোঁজ করতে ছোট রাজকুমার বেরিয়ে পড়ল, জঙ্গলের প্রান্তে গাছের নীচে সেই শেয়ালের সাথে ছোট রাজকুমার এর দেখা হল। সে বলল আগে গিয়ে দেখবে একটি সুন্দর চৌমাথা পাবে। আর একটি খুব জঙ্গলযুক্ত চৌমাথা পাবে। তুমি সুন্দর চৌরাস্তায় না গিয়ে জঙ্গলযুক্ত চৌমাথায় যাবে। শেয়ালের কথা মতো ছোট রাজকুমার তাই করল। সেখানে পুনরায় সেই শেয়ালের সাথে তার দেখা হল। তখন শেয়াল বলল তুমি সোজা গিয়ে রাজার বাড়ি পাবে, সেখানে একটি কাঠের খাঁচায় সোনার পাখিটি আছে। পাখিটাকে অনেকেই পাহারা দিচ্ছে। তুমি গেলে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি কিন্তু শুধু কাঠের খাঁচাটি তুলে নিয়ে আসবে। সেখানে সোনার খাঁচাও থাকবে তাতে হাত দেবে না। রাজকুমার সেখানে প্রবেশ করল সকলে তখন ঘুমিয়ে ছিল। শেয়ালের কথামতো কুমার কাঠের খাঁচার সোনার পাখিটি হাতে নিল। পরে ভাবতে লাগল সোনার পাখি কাঠের খাঁচায় মানায় না, তাই সে সোনার খাঁচায় হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি চিৎকার শুরু করে দিল, পাখির চিৎকারে প্রহরীরা জেগে উঠল এবং রাজকুমারকে বন্দি বানিয়ে সেই দেশের রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। কিন্তু তাকে বলল, যদি সে একটি কাজ করতে পারে, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কুমার বলল তাকে কী করতে হবে। পাশের রাজ্যের ঘোড়শালায় একটি সোনার ঘোড়া আছে সেটি যদি সে এনে দিতে পারে , সে তাতে রাজি হয়ে গেল। সে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সেই শেয়ালের সাথে আবার তার দেখা হল। শেয়াল বলল তুমি রাজ্যে গিয়ে ঘোড়শালায় সোনার ঘোড়াকে চামড়ার লাগাম দিয়ে তারে পিঠে চড়ে নিয়ে আসবে, সোনার ও মণিমুক্তার লাগাম নেবে না। যখন রাজ কুমার সেখানে গেল সকলে ঘুমিয়ে ছিল। যখন রাজপুত্র ঘোড়াটি সোনার দেখে তার সাথে চামড়া লাগাম মানাবে না ভেবে মুনিমুক্তা সোনার লাগামটিতে হাত দিল। তখনই সবাই জেগে গেল এবং রাজকুমারকে বন্দি বানাল। রাজার কাছে নিয়ে গেলে সেখানে তার প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। কিন্তু সেই রাজ্যের রাজা বলল, পাশের রাজ্যের সোনার রাজকন্যাকে যদি সে এনে দিতে পারে তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে বেরিয়ে পড়ল পথে সেই শেয়ালটার সাথে তার দেখা হল। শেয়াল বলল, কাল বিকেলে যখন রাজকন্যা স্নানের জন্য পুকুরে আসবে সেখানে তাকে স্পর্শ করলে রাজকন্যা তার সাথে আসতে রাজি হয়ে যাবে কিন্তু তাকে আর ছাড়া চলবে না। ছেড়ে দিলে বিপদ। শেয়ালের কথামতো সে দেখল রাজকন্যা স্নানের জন্য পুকুরে এলে তাকে স্পর্শ করলে সে তার সঙ্গে আসতে রাজি হয়ে যায়। তাকে নিয়ে আসতে থাকে। মহলে রাজকন্যা বলে বাবা, মার সঙ্গে দেখা করেই চলে আসব। কিন্তু শেয়াল বলেছিল সে যেন আর তাকে না ছাড়ে, তা সত্ত্বেও রাজকন্যাকে তার বাবা -মার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য ছেড়ে দেয় তখন প্রহরীরা

এসে তাকে বন্দি বানায়। শেয়াল এসে তাকে বলে যে রাজকন্যাকে নিয়ে গভীর রাতে পালিয়ে যেতে। রাজকন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র আগের রাজার কাছে গেল। সেখান থেকে সোনার ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যকে নিয়ে সোনা পাখির রাজার দেশে গেল এবং সেখানে এসে খাঁচা সমেত পাখিটি নিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে ও এল। বনের মধ্যে শেয়ালের সাথে দেখা হলে সে জানাল এই সব নিয়ে দেশে ফিরে যাও। রাস্তায় দুটি কাজ করবে না। রাজকুমারী ও সোনার পাখিটি নিয়ে দেশে ফেরার পথে সে দেখল দুই ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হয়েছে। সে নিকটে গিয়ে দেখে তার দুই দাদা ঐ ব্যক্তিগণ। তাদের বাঁচাতেই হবে। কিন্তু শেয়ালের বারণ সত্ত্বেও সে তাদের বাঁচাল। শেয়াল যে দুটি কাজ বারণ করেছিল তা হল, 'কুয়োর পাড়ে বসবে না, এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না। ছোট রাজকুমার দাদাদের বাঁচানোর পর সব কথা খুলে বললে তার দাদারা ঈর্শন্বিত হয়ে যায়। সামনে একটি কুয়োর পাড়ে ছোট রাজকুমার বসলে তার দাদারা তাকে কুয়োয় ফেলে দেয়। কুয়োর জল কম ছিল তাই সে বেঁচে গেলেও গভীর ছিল বলে উঠতে পারছিল না। তখন শেয়াল এসে সব বলা সত্বেও এই কাজগুলি করার জন্য তাকে ভৎর্সনা দিতে লাগল। এতসব শুনেও শেয়াল তাকে বাঁচাতে তার লেজ লম্বা করে কুয়ো থেকে বের হতে বলল। সেখান থেকে বেঁচে ফিরে সে রাজ্যে গেল। সেখানে রাজা তার সব কথা জানতে পেরে পুরস্কৃত করল এবং রাজত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। সেকথা শুনে অপর দুই রাজপুত্র হিংসায় তাকে মারার পরিকল্পনা করতে লাগল। একদিন ছোট রাজকুমার বনের দিকে গেলে শেয়ালের দেখা পায়। শেয়াল বলে তুমি আমাকে তীর দিয়ে মেরে ফেল। রাজপুত্র অবাক হয়ে বলল কেন? তখন শেয়াল বলল, আমি সোনার রাজকন্যার দাদা। আমি অভিশাপে শেয়াল হয়েছি। তুমি আমাকে মুক্ত কর। তখন রাজপুত্র শেয়ালকে তীরবিদ্ধ করলে সে রাজপুত্রের রূপ নেয়। রাজপুত্র, রাজকন্যা সুখে দিন যাপন করতে থাকে। কিন্তু তার দাদারা অর্থাৎ অপর দুই রাজকুমার চিরশত্রুতে পরিণত হয়। তাই ভাই এর মত বড় শত্রু আর কেউ নাই।

— ঃ —

প্রথম বর্ষ

১। সৌগত গিরি
গ্রাম - বেনাচাপরা
পোঃ- মামড়া
থানা - তালডাংরা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৯

২। অর্ণব রজক
গ্রাম - তোফা
পোঃ- খড়কুষ্মা
থানা - গড়বেতা
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১১২৭

৩। দেবাঞ্জন পাঙ্গাস
গ্রাম - সাতমৌলি
পোঃ - সাতমৌলি
থানা - তালডাংরা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন-৭২২১৪৯

৪। রাহুল সরকার
গ্রাম - নাচনকোন্দা
পোঃ- সাবড়াকোন
থানা-তালডাংরা
জেলা-বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৯

৫। সাহেব মল্ল
গ্রাম-কেশিয়াকোল
পোঃ-কেশিয়াকোল
থানা - বাঁকুড়া
জেলা - বাঁকুড়া
পিন -৭২২১৫৫

৬। প্রত্যুষ গুইন
গ্রাম - পাঁচমুড়া
পোঃ - পাঁচমুড়া
থানা-তালডাংরা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন- ৭৮২২১৫৬

৭। রাখ কুম্ভকার
গ্রাম - পাঁচমুড়া
পোঃ-পাঁচমুড়া
থানা-তালডাংরা
জেলা-বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫৬

৮। শুভদীপ মণ্ডল
গ্রাম -
পোঃ -
থানা -
জেলা -
পিন -

৯। শত্রুঘ্ন প্রামাণিক
গ্রাম - আসনা
পোঃ - তালডাংরা
থানা - তালডাংরা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

১০। উজ্জ্বল শো
গ্রাম - জিয়াবান্দি
পোঃ- জিয়াবান্দি
থানা - বিষ্ণুপুর
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৬৪

১১। সোমনাথ দুলে
গ্রাম - নবগ্রাম
পোঃ - হাড়মাসড়া
থানা - তালডাংরা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

১২। অরূপ মণ্ডল
গ্রাম - পিঠাবাঈদ
পোঃ - শালডিহা
পিঠাবাঈদ
থানা - ছাতনা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৯

১৩। শান্তনু বাউরী
গ্রাম - সিমলা
পোঃ - মানতুমরা
থানা - ছাতনা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

১৪। বিকাশ মাহাত
গ্রাম - পুনশ্যা
পোঃ - কদমাগড়
থানা - রানিবাঁধ
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৮

১৫। সৌরভ বাউরী
গ্রাম - সিমলা
মোঃ - মানতুমরা
থানা - ছাতনা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

১৬। সুমন্ত রায়
গ্রাম - নেকরা কুন্দা
পোঃ - কমলপুর
থানা - ছাতনা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

১৭। অনল কুমার সরেন
গ্রাম - হাতিবাড়ি
পোঃ - রামসাগর
থানা - ওন্দা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৭

১৮। সুরজিৎ দুবে
গ্রাম - ডাংমেজিয়া
পোঃ - ডাংমেজিয়া
থানা - মেজিয়া
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৩

১৯। মিলন হেমব্রম
গ্রাম - পাপড়ারা
পোঃ - পাপড়ারা
থানা - খড়গপুর লোকাল
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১১৪৯

২০। অমিয় দুলে
গ্রাম - দুলালপুর
পোঃ - মইধরা
থানা - সিমলাপাল
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৬০

২১। সুদীপ মাহাত
গ্রাম - আদালিয়া
পোঃ - ছোটনাকদোনা
থানা - গোলতড়া
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১১৫৭

২২। রাজীব বাঙ্গাল
গ্রাম - কাওয়াবাসা
পোঃ - মন্দারবনি
থানা - ওন্দা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

২৩। পীযূষ নন্দী
গ্রাম - যসপাড়া
পোঃ - পরকুরা আনাড়া
থানা - রাইপুর
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

২৪। শুভজিৎ মহাপাত্র
গ্রাম - চৌতাড়
পোঃ - চৌতাড়
থানা - সারেঙ্গা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

২৫। সুমন লোহার
গ্রাম - চৌতাড়
পোঃ - চৌতাড়
থানা - সারেঙ্গা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

২৬। সায়ক নন্দী
গ্রাম - রুইশহর
পোঃ - শ্যামনগর
থানা - জয়পুর
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৮

২৭। মুকুল ঘোষ
গ্রাম - দুমকুড়িয়া
পোঃ - ঘোলকুণ্ডা
থানা - ওন্দা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

২৮। সৌভিক মিদ্যা
গ্রাম - কোলমুরারী
পোঃ - মৌলাশোল
থানা - বারিকুল
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৬২

২৯। মনোজিৎ ঘোষ
গ্রাম - ফুলুই
পোঃ - শ্যামবাজার
থানা - গোঘাট
জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১২২

৩০। কৌশিক সৎপতি
গ্রাম - মণ্ডলগ্রাম
পোঃ - মণ্ডলগ্রাম
থানা - সিমলাপাল
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫৬

৩১। সুজয় সরেন
গ্রাম - ফুলকুসমা
পোঃ - ফুলকুসমা
থানা - বারিকুল
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৬২

৩২। তন্ময় বাউরী
গ্রাম - কাঞ্চনপুর
পোঃ - শীতলা
থানা - বড়জোড়া
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২২০২

৩৩। জয় চৌধুরী
গ্রাম মাধবপুর
পোঃ - সাবড়াকোন
থানা - তালডাংরা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৯

৩৪। অমিত কুণ্ডু
গ্রাম - যন্তা
পোঃ - যন্তা
থানা - বিষ্ণুপুর
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১২২

৩৫। বাপন লায়েক
গ্রাম - পুরুষোত্তমপুর
পোঃ - আগরদা
থানা - ওন্দা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৪

৩৬। বিপদতারণ মুর্মু
গ্রাম - বনকানালি
পোঃ - রাইডি
থানা - রাইপুর
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪০